ফরজ ইলমের পরিচয়

শাইখ আবদুল কাদির

মাওলানা মাহদী হাসান জামিল
অনূদিত
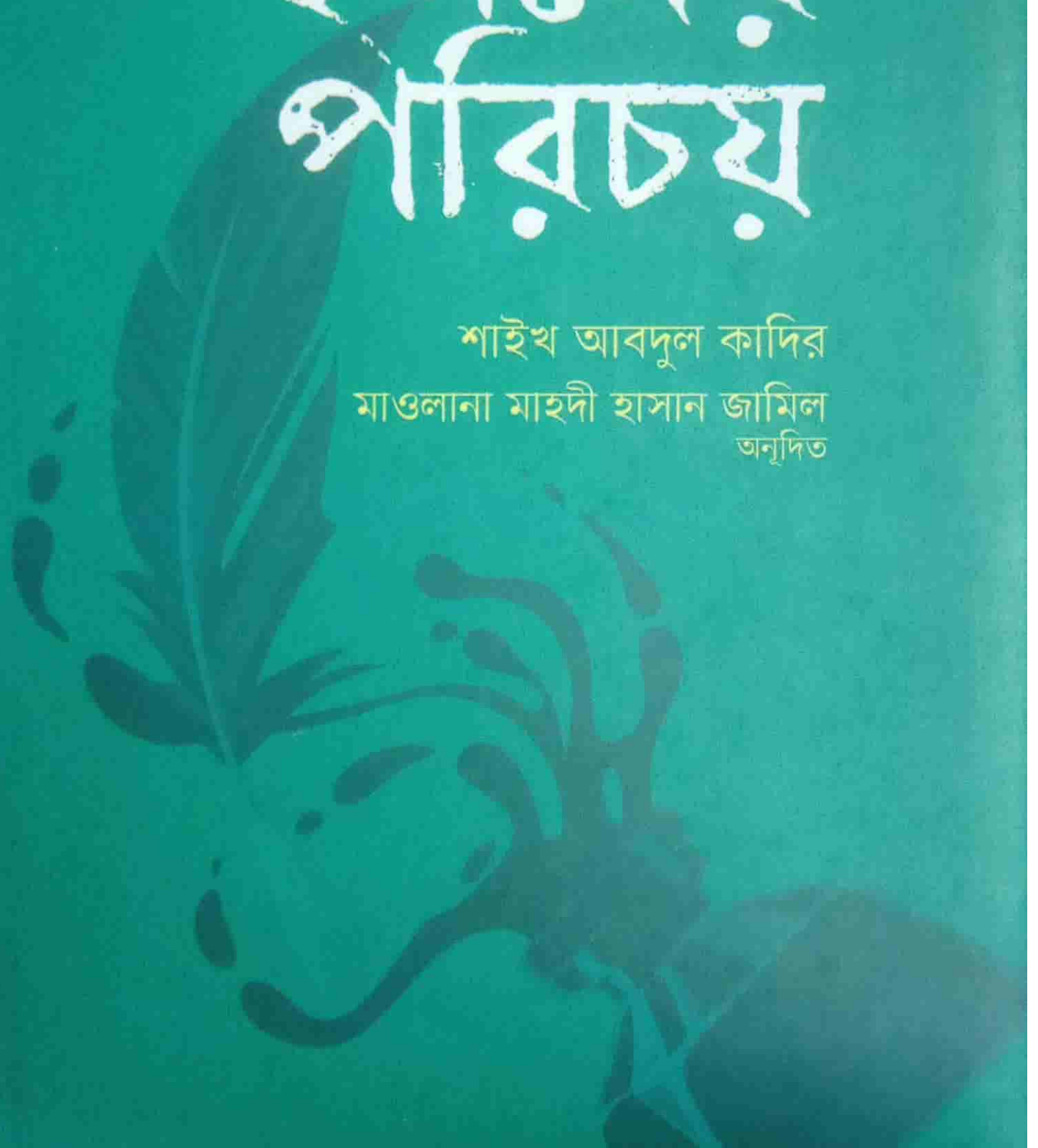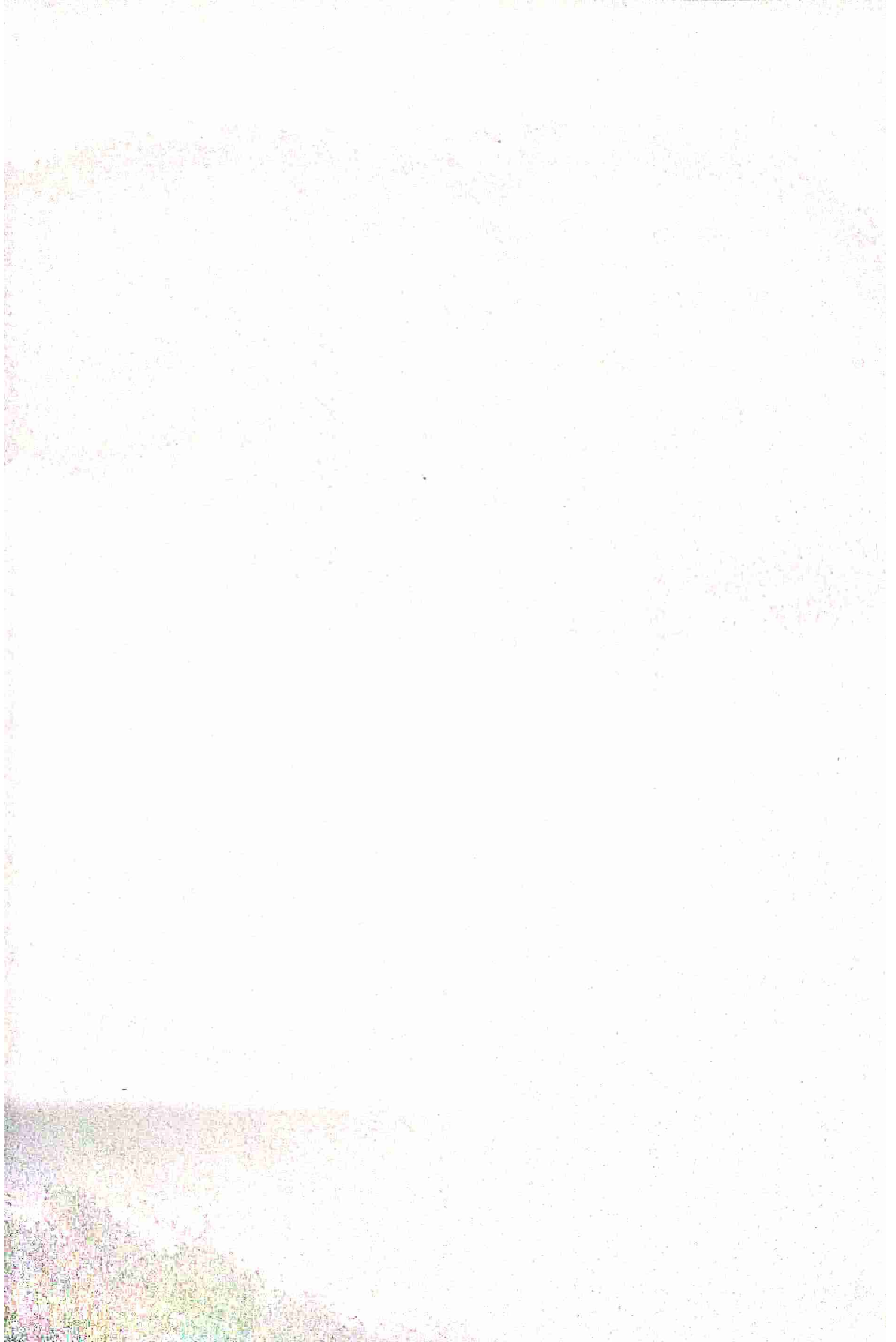
ফরজ ইলমের পরিচয়

ফরজ ইলমের পরিচয়

মূল
শাইখ আবদুল কাদির
অনুবাদ
মাওলানা মাহদী হাসান জামিল
সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

নাশাত

নাশাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
বৈচিত্র্যময় কোরআন : দৃশ্যমান বৈপরীত্য ও সমাধান/ ইমরান হোসাইন নাঈম
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী
হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব/ ইফতেখার সিফাত
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত / মাওলানা ইসমাইল রেহান
ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
আধুনিকতা/ প্রফেসর হাসান আসকারি
ইলমে কালামের সহজ পাঠ/ খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত/ সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ.
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
হারিয়ে যাওয়া পদরেখা/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
তুরস্কে পাঁচ দিন/ ড. মুসতফা কামাল
নির্বাসিতের জবানবন্দি/ সুলতান আবদুল হামিদ রহ.
বেলালের আত্মস্বর/ সৈয়দ সালিম গিলানী
কারাবাসের দিনগুলি/ জায়নাব আল গাজালি
অগ্রন্থিত রচনাবলি : আল মাহমুদ/ মুহিম মাহফুজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের রব, যার রুবুবিয়্যাতের করুণায় আমরা নাস্তি থেকে অস্তিত্ব লাভ করি এবং জীবন নির্বাহ করি। দরুদ বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনীত নববি শরিয়তের অবারিত ছোঁয়ায় আমাদের অন্তর জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। সালাত বর্ষিত হোক তার পরিবারবর্গ, সাহাবি ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত তার সকল অনুসারীর উপর।

ইসলামে ইলমে দীন শেখার গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনে কারিমের অনেক আয়াত এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু হাদিসে ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। তবে ইলম অর্জনের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা অনেক দুরূহ, যদি না আল্লাহ তায়ালা এর মর্ম-ভেদ আমাদের অন্তরে ঢেলে দেন। দীনে ইলমের জন্য কারো অন্তর খুলে দেওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার একান্ত অনুগ্রহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।'

আমরা প্রথমেই আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের বক্ষদেশ ইলমের জন্য প্রশস্ত করে দেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাহ (বিশেষ জ্ঞান) দান করেন এবং যাকে হিকমাহ দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।'[১]

আয়াতে বলা হয়েছে, হিকমাহপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা মূলত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক মহা কল্যাণকর বস্তুই প্রাপ্ত হয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে দোয়া শিখিয়েছেন—'হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও।'[২]

ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন : যদি ইলম থেকে উত্তম কিছু থাকত তবে আল্লাহ তায়ালা তার নবী আলাইহিস সালামকে তা-ই বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে বলতেন; যেমন তিনি এ আয়াতে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ।'[৩]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত ২৬৯

[২] সুরা ত-হা, আয়াত ১১৪

[৩] মুসনাদে আবু হানিফা (হাসকাফি), হাদিস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৪

হাদিস শরিফে ইলম অর্জনকে ফরজ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, দীনি ইলমের একটি অংশ অর্জন করা সকল মুসলিমের উপর ফরজ। অন্য এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেন—'যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ তায়ালা এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।'[৪]

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। আর ইবাদতের পূর্বশর্ত হচ্ছে ইলম অর্জন করা। ইলম ছাড়া যিনি আমল করেন, তিনি অর্জনের চেয়ে বরবাদই করেন বেশি। তাবেয়ি উমর ইবনে আবদুল আযিয রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।[৫]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ প্রমাণ করে যে, বান্দার ইলম শিখতে হবে এবং তা শিখতে হবে নিজ নিজ আমল সহিহ করার জন্য। এ পর্যায়ে গুরুত্বের সাথে জানতে হবে ইলম কার কাছ থেকে এবং কীভাবে শিখতে হয়। এককথায় এর উত্তর হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ থেকে সাহাবায়ে কেরাম হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত ইলমের অধিকারী একজন মুখলিস উসতায থেকে ইলম শিখতে হবে। ইলম শেখার যতগুলো মাধ্যম আছে, তন্মধ্যে একজন প্রকৃত মুখলিস উসতাযের সমতুল্য বা বিকল্প কল্পনা করা অসম্ভব। উসতাযের সোহবত ছাড়া কখনোই সেই অর্থে ইলম অর্জন হয় না, যে অর্থে ইলমকে ইলম বলা হয়েছে। মুফতি শফি রহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'ইলম বলা হয় সেই নুরকে, যা অর্জনের পর সেই অনুযায়ী আমলের জন্য অন্তরে অস্থিরতা শুরু হয়। আর উসতায ছাড়া এই মানের ইলম অর্জন অসম্ভব।'

ইলম শেখার গুরুত্ব বুঝাতে কুরআনের যে আয়াতটি সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়, তা হলো :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অতএব জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।[৬]

আয়াতে 'আহলে জিকর' বলে ইলমে নববির মুতাওয়ারিস জ্ঞানপ্রাপ্ত একজন প্রাজ্ঞ উসতাযের কথাই বলা হয়েছে, আসমানি ইলম সম্পর্কে যার পূর্ণ অবগতি রয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে।[৭]

---

[৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৬৯৯

[৫] তারিখে তাবারি ৬/৫৭২

[৬] সুরা নাহল, আয়াত ৪৩

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতিব বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন :

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصَّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের জবান থেকে; কেবল বইপুস্তক থেকে নয়।[৮]

আজকাল জ্ঞানের উপকরণ ও নানা উপায় অবলম্বনের সহজীকরণের কারণে অনেকের অন্তর থেকেই ইলম অর্জনের এই প্রাচীন পদ্ধতির গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। মানুষ প্রশ্ন তুলছে ইন্টারনেটের যুগে উসতাযের কাজ কী (মাআজাল্লাহ)? কেউ কেউ তো অনলাইন-নির্ভর ইলম শিখে ইলম অর্জনের ফরজিয়াতের দায়িত্বও আদায় করতে চায়। অথচ যথেষ্ট পরিমাণ সোর্স থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের দুনিয়াবি ইলমগুলো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে, বহু অর্থ খরচ করে উসতাযের কাছেই শিখছে। অথচ উসতাযবিহীন ইলম শেখার পথে রয়েছে অসংখ্য চোরাবালি, ইলমের নামে রয়েছে এমন অনেক আবর্জনা, যা তালিবুল ইলমকে আদর্শচ্যুত করতে পারে এবং নিয়ে যেতে পারে চিন্তার ভ্রান্তির দিকে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। আমরা দেখছি উসতাযবিহীন মাথাভর্তি জ্ঞান দরবারে ইলাহীতে একটি সেজদার জন্য অনেকের মস্তকই অবনত করতে পারছে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হিফাজত করুন।

ইলম অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে আমরা প্রায়ই কুরআনের নাজিলকৃত প্রথম আয়াতটি তুলে ধরি। আমরা বলি ইকরা, পড়। এখানে আমাদের খেয়াল করা উচিত নিজস্ব ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এই 'ইকরা' শব্দটি উচ্চারণ করতে হেরাগুহায় জিবরিল আমিনের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তত তিনবার মোলাকাত করতে হয়েছিল। তাই আমাদের ইলম শিখতে হবে একজন প্রাজ্ঞ উসতাযের কাছে, যতদূর সম্ভব তার সোহবতে থেকে।

আমলের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী ইলমের নানা স্তর রয়েছে। সাধারণত আলেমগণ বলেন, যে আমল ফরজ, তার ইলম অর্জন করাও ফরজ। ওয়াজিব আমলের ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। ফিকহের একটি বিখ্যাত উসুল হচ্ছে, 'যা অর্জন করা ছাড়া ওয়াজিব আদায় করা সম্ভব হয় না তা অর্জন করাও ওয়াজিব'। ফরজে আইন আমল যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি ইলমের একটা স্তর রয়েছে, যা শেখা ফরজে আইন। আর ফরজে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে :

---

[৭] সহিহ বুখারি ১/২৪

[৮] আলফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতিব বাগদাদি ২/১৯৩

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ।[১]

সাধারণত ঈমান, আকিদা, নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করা এবং হারাম কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার একনিষ্ঠ আনুগত্য করা, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা, সামর্থ্য থাকলে হজ করা, জুমআ ও জিহাদের পাবন্দি করা, জানাবাত তথা শরীর নাপাক হলে গোসল করা, পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা, সালাতের জন্য ওজু করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। এ ছাড়া মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। অধীনস্থদের শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাই ফরজ পরিমাণ ইলম শেখা ও শেখানো একটি পরিপূর্ণ ফরজ। এবং এটি ঈমানের অন্যতম শাখা। কিন্তু কী পরিমাণ ইলম শিখলে সেই ফরজ দায়িত্ব আদায় হবে তা আমাদের অনেকেরই অজানা। সাধারণত আমাদের দেশে দীনি শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে 'ফরজ ইলমে'র যে তালিকা পেশ করা হয় তা প্রয়োজনীয় হলেও পরিপূর্ণ নয়। এমন অনেক বিষয় থেকে যায়, যা শিক্ষা করা ফরজে আইন। এমতাবস্থায় ফরজ ইলমের একটি পরিপূর্ণ তালিকা পেশ করা ছিল সময়ের দাবি।

শাইখ আবদুল কাদির (বিন আবদুল আজিজ) একজন বিখ্যাত আলেম। ইলম বিষয়ে রচিত তার অনবদ্যগ্রন্থ 'আল-জামি লি তলাবি ইলমিশ শারিফ'। উক্ত গ্রন্থে তিনি ইলমের কোনো অধ্যায়য়ের আলোচনাই বাদ রাখেননি। সেই গ্রন্থেরই তৃতীয় অধ্যায় 'ফরজ ইলমের' আলোচনা। তিনি সেখানে বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। এই বই উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ। শাইখ তার আলোচনায় কুরআন, হাদিস এবং সালাফের বক্তব্যের মাধ্যমে পাঁচটি বিষয় গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। (ক) শরিয়াহর প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা। (খ) কথা ও কাজ শুরু করার আগে ইলম শিক্ষা করার অপরিহার্যতা। (গ) ফরজে আইন পরিমাণ ইলমের পরিচয়। (ঘ) ইলম ফরজ হওয়ার দলিল। (ঙ) ফরজে আইন ইলমের প্রকারভেদ। এ ছাড়া শুরুতে শাইখ ইলমের প্রকারভেদ ও শরিয়তের ইলম অর্জনের হুকুম নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দীনে ইলম শিখতে আগ্রহী এবং দীন পালনকারী ভাইদের দীর্ঘদিন থেকে আগ্রহ ছিল ফরজ ইলমের তালিকা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা, যাতে তারা

---

[১] মুসনাদে আবু হানিফা (হাসকাফি), হাদিস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৪

নিজেরা তা শিখতে ও শেখাতে পারেন। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে এটি সম্পন্ন হয়েছে। আমরা আশাকরি পাঠক এই বই থেকে উপকৃত হবেন এবং ইলম অর্জনের ফরজিয়্যাত সম্পর্কে অবগতি লাভ করবেন। আল্লাহ তায়ালা মূল লেখক ও অনুবাদকের এই খেদমতটকু কবুল করুন। কবুল হওয়া হাজারো গ্রন্থের মাঝে একেও জায়গা করে দিন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত পেরেশানি দূর করে দিন। আমিন।

মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

অনুবাদকের কথা

যে জ্ঞান সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, জাতিকে সর্বজনীন উৎকর্ষে পৌঁছাতে পারে না, মনে করতে হবে সেই জ্ঞানের মৃত্যু ঘটেছে। তার পুনর্জীবন জরুরি।

মানবসভ্যতার দুটি দিক রয়েছে। একটি পার্থিব, অপরটি শরয়ি। কালপরিক্রমায় অনেক সভ্যতারই উত্থান ঘটেছে। আবার একটা সময়ে তার পতনও হয়েছে। তবে জ্ঞান ও জীবনাচারের মূল্যবোধ তৈরিতে কিছু কিছু সভ্যতা উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছেছিল। দীর্ঘ সময় দোর্দণ্ড প্রতাপে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। পরিশেষে এর ক্ষয় ঘটেছে। রুখতে পারেনি তারা নিজেদের লয়। এর মূল কারণ হলো, তৎকালীন সভ্যতাগুলোতে জ্ঞানের অপমৃত্যু ঘটেছিল। পার্থিব জ্ঞানের উৎকর্ষ ঠিকই ছিল। বস্তুবাদী জ্ঞানচর্চায় অনেক শ্রম দিয়েছিল তারা। কিন্তু অভাব ছিল নৈতিকতার। শরয়ি জ্ঞানচর্চার। আসমানি গ্রন্থগুলোর দিকনির্দেশনা বরাবরই তাদের কাছে উপেক্ষিত ছিল।

ফলে দেখা গেছে, বিগত সভ্যতার ধারক-বাহকগণ ক্ষেত্রবিশেষ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। কিছু চোখধাঁধানো পার্থিব উন্নয়নও ঘটিয়েছিল। কিন্তু এই পার্থিব জ্ঞানচর্চার সাথে ঐশী জ্ঞানের সমন্বয় না ঘটায়, শরয়ি মোড়কে বস্তুবাদী জ্ঞান চর্চিত না হওয়ায় সভ্যতার ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়, যার পরিসমাপ্তি ঘটে পতনোন্মুখ খাদের কিনারায় নিক্ষিপ্ত হয়ে।

মুসলিম হিসেবে আমরা একটি জাতি, একটি সভ্যতা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। শেষনবীর উম্মত বানিয়েছেন। আখেরাতে কল্যাণ ও দুনিয়াতে একটি উন্নত জাতি হিসেবে যেন আমরা সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, এর জন্য দিয়েছেন শরয়ি বিধান।

আল কুরআনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এতে দু'ধরনের জ্ঞানের কথা আলোচিত হয়েছে। সহজসাধ্য জীবনযাপনের জন্য পার্থিব জ্ঞান আরেকটি হলো শরয়ি জ্ঞান। আবার আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন- যেই পার্থিব জ্ঞানচর্চা শরিয়তের চাহিদা মাফিক উপস্থাপিত হবে না, আল্লাহর মারেফাত অর্জন হবে না, সেটা কোনো জ্ঞানই না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই শরয়ি জ্ঞানটুকু আমরা কজনই-বা জানি? অথচ নবীজি বলেছেন :

طلب العلم فريضة على كل مسلم

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলম অন্বেষণ করা ফরজ।

আমাদের কজনেরই-বা ফরজ ইলমের সুস্পষ্ট ধারণা আছে, যা শিক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক?

তোতা পাখির বুলির মতো শৈশব থেকেই কালেমা পড়েছি। তাওহিদের কথামালা মুখস্থ করেছি; কিন্তু তাওহিদের মর্ম কী, কী করলে ঈমান ভঙ্গ হয়, আমাদের ঈমান আছে কি না, ঈমান রক্ষা করতে হলে কতটুকু জানাশোনা প্রয়োজন, জানার পরিধি কেমন হবে- কখনো কি এসব নিয়ে আমরা ভেবেছি?

যাপিত জীবনের তাগিদে আমরা বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকি। জীবনের পরতে পরতে নিজেদেরকে লেনদেনের সাথে জড়িয়ে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে 'ফরজে আইন ইলম' কী, কতটুকু এর পরিমাণ, কজন আলেমই-বা বলতে পারব?

হালজমানায় মুসলিমদেশগুলো গণতান্ত্রিক রশিতে বাঁধা। রাষ্ট্রযন্ত্রের মূলে রয়েছে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী ধর্মহীন শাসনব্যবস্থা। প্রতিনিয়ত আমরা নিজেদের সমস্যার সমাধান পেতে রাষ্ট্রযন্ত্রের শরণাপন্ন হচ্ছি। এখানে ফরজ ইলমের বিষয় আছে কি না তা কি কখনো খতিয়ে দেখেছি?

জীবনঘনিষ্ঠ এমন অনেক বিষয় ফরজ ইলমের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রত্যেক মুসলমানের জানা ওয়াজিব। কিন্তু সেই বিষয়গুলো কী এবং এর সীমারেখা কতটুকু তা না-জানার কারণে অনেক দৃষ্টি সেদিকে পড়ছে না। তাই তারা তা শেখার প্রতি মনোনিবেশ করছে না। অন্যকে শেখার জন্যও বলছে না। এভাবেই যাপিত জীবনের বাস্তবমুখী ইলম উপেক্ষিত হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষ ক্রমশ ইসলামি ভাবধারা থেকে দূরে সটকে পড়ছে।

শরয়ি জ্ঞানচর্চার এই যখন অবস্থা, জ্ঞানের দীনতায় মানুষের এরকম বেহাল দশা; তখন তো বলতেই হয়, সাধারণ মুসলমানদের শরয়ি জ্ঞানচর্চায় অবহেলা ও অলসতার কারণে শরয়ি জ্ঞানের অপমৃত্যু ঘটেছে। তাই, এর পুনর্জীবন দান করতে, সজীবতা ফিরিয়ে আনতে, মিসরীয় খ্যাতিমান লেখক-গবেষক শাইখ আবদুল কাদের ইবনে আবদুল আযিয হাফিজাহুল্লাহ তার الجامع في طلب العلم الشريف গ্রন্থে সেই মহান কাজটি আনজাম দিয়েছেন। ফরজে আইন ইলম কী এবং এর সীমারেখাই-বা কতটুকু তা তিনি উক্ত কিতাবে উল্লেখ করেছেন; সাবলীল ভাষায়, নান্দনিক উপস্থাপনায়। সাধারণ মানুষের প্রয়োজন-বিবেচনায় কিতাবটি অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছেন নাশাত পাবলিকেশন। সেই সুবাদে অনুবাদের দায়িত্ব পড়েছে আমারে কাঁধে।

উল্লেখ্য যে, পুরো বইটি এখানে অনুবাদ করা হয়নি। শুধু 'ফরজে আইন ইলম' সম্পর্কিত অধ্যায়টি অনূদিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষুদ্র কাজটি কবুল করুন। আমাদের নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

মাহদী হাসান জামিল
২ রমজান, ১৪৪২
টংগিবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ

ফরজে আইন পরিমাণ শরয়ি ইলম সম্পর্কে এখানে মোট পাঁচটি আলোচনা রয়েছে :

শরিয়তের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।[১০]

যারা ধারণা করে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজীবকে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি স্বীয় সত্তাকে মানুষের কল্পনাপ্রসূত কথাবার্তা থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক।'[১১] অর্থাৎ তিনি এই অলীক ধারণা থেকে পবিত্র। কারণ, কোনো জিনিস আল্লাহর হেকমতের বাইরে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?'[১২]

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলকে বানিয়েছেন তার ইবাদতের জন্য। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কুরআনে বলেছেন—'আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।'[১৩]

আর ইবাদত বলা হয়, নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যে শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন, তা যথাযথভাবে পালন করা। অল্পকথায়- আদেশ ও নিষেধ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত বান্দাদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

---

[১০] সুরা মুমিনুন, আয়াত ১১৫, ১১৬
[১১] সুরা মুমিনুন, আয়াত ১১৫, ১১৬
[১২] সুরা তিন, আয়াত ৮
[১৩] সুরা জারিয়া, আয়াত ৫৬

যে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য।[১৪]

অবাধ্য বান্দাদের জাহান্নামের হুমকি প্রদর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

যে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করে এবং সীমা লঙ্ঘন করে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।[১৫]

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُّتْرَكَ سُدًى

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?'[১৬]

ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—'আমার জানামতে কুরআনের পরিপূর্ণ ইলম অর্জনকারী কোনো আলেম سُدًى-এর উদ্দেশ্য যে 'আদেশ-নিষেধ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া' এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত করেননি।'[১৭] অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে, তার উপর দায়িত্ব ও বিধিনিষেধ আরোপ করা ছাড়া এভাবেই তাকে দুনিয়াতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

শরয়ি বিধান তথা ইবাদতের সারাংশ হলো 'আদেশ ও নিষেধ', যা পালনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুত জান্নাত অর্জিত হয় কিংবা তাতে অবহেলার কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেতে হয়। আর এই আদেশ-নিষেধকে তখনি আমলে আনা সম্ভব, যখন সেগুলোর ব্যাপারে বান্দা অবগতি লাভ করবে। আর 'শরিয়াহ'ই হলো সেসব জানার একমাত্র পথ। অবশ্য এর বিপরীতে অনেকে মনে করেন 'আকলে'র মাধ্যমে এগুলো জানা সম্ভব; অথচ এটা ভুল চিন্তা। কেননা সৃষ্টিজীবের আকল বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনো এমন হয় যে, একজন যে বিষয়টি ভালো মনে করে, ঠিক ওই জিনিসটিই অন্যজন মন্দ মনে করে। এজন্য মিথ্যা থেকে সত্য পৃথক করার, ভালোকে মন্দ থেকে আলাদা করার একমাত্র মাধ্যম হলো শরিয়ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

---

[১৪] সুরা নিসা, আয়াত ১৩

[১৫] সুরা নিসা, আয়াত ১৪

[১৬] সুরা কিয়ামাহ, আয়াত ৩৬

[১৭] ইমাম শাফেয়ি রচিত কিতাবুল উম : ৭/২৯৮, (দারুল মাআরিফ)।

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশে। আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে করেছি নুর, যদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।[১৮]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আদমের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিচ্ছেন- নবীজি ওহি আসার আগ পর্যন্ত, 'কিতাব কী এবং ঈমান কী', এ-ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন। ঐশী-মাধ্যম ব্যতিরেকে সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ জানার জন্য তখন যদি কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি থেকে থাকতেন, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হতেন সেই ব্যক্তি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার প্রদত্ত 'ওহি ও শরিয়ত'কে 'নুর' নামে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ

আমি একে করেছি নুর, যদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি।[১৯]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন :

مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোনো জ্যোতিই নেই।[২০]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, শরিয়াহপ্রদত্ত নুর ছাড়া মানুষের অধিকারে এমন কোনো নুর নেই, যার মাধ্যমে সে পথপ্রাপ্ত হবে এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে।

এর মানে এই নয় যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণে আকলের কোনো ভূমিকা নেই; বরং ঐশী নির্দেশনা ছাড়া যে আকল স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়- তা বুঝানো উদ্দেশ্য। যদি ভালো-মন্দ পার্থক্য নির্ণয়ে বিবেক স্বনির্ভর হতো, তাহলে শরিয়ত নিয়ে নবীগণের আগমনের কোনো প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু তাদের অর্থহীন প্রেরণ করা থেকে আল্লাহর সত্তা পবিত্র।

---

[১৮] সুরা শুরা, আয়াত ৫২
[১৯] সুরা শুরা, আয়াত ৫২
[২০] সুরা নুর, আয়াত ৪০

আলোচনার সারকথা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো-মন্দের বোধগম্যতায় যুক্তির দখল রয়েছে; তবে যুক্তির উপর নির্ভর করে ওয়াজিব ও হারামের মতো বিধান সাব্যস্ত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন স্রষ্টা-প্রবর্তিত শরিয়ত, যা নবীগণ নিয়ে এসেছেন। আর এ বিষয়টি বুঝাতেই আলেমগণ বলে থাকেন لا حكم قبل ورود الشرع অর্থাৎ ঐশীবিধান আসার পূর্বে কোনো হুকুম (বান্দার উপর) আরোপিত হয় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন : 'শরিয়তের প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যক। আর তা হলো, আল্লাহ যে-কাজের আদেশ করেছেন, যার থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যেই বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যার ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন- তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। নবীগণ তো উপর্যুক্ত বিধানাবলি নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর কিতাব নাজিল করেছেন। মানুষ তার ইহজাগতিক জীবনে শরয়ি নির্দেশ পালনে বাধ্য। কারণ, মানুষের কাছে এমন এক মানদণ্ড থাকা জরুরি, যার সহযোগিতায় সে কল্যাণকর বিষয় গ্রহণ করবে এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকবে। আর শরিয়তই হলো সেই মানদণ্ড, যার মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়, যা স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি ইনসাফ এবং তার বান্দাদের জন্য জ্যোতি। সুতরাং বলা যায়, বনি আদমের জন্য শরয়ি নির্দেশনা ছাড়া জীবনযাপন অসম্ভব, যা তাদের করণীয়-বর্জনীয় বিষয় চিহ্নিত করে দেবে।'[২১]

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ আরও বলেন : 'রিসালাত তথা রাসুলগণের আনীত বিধান দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার কল্যাণের জন্য অতীব জরুরি বিষয়। যেমনভাবে রিসালাতের অনুগামী হওয়া ছাড়া বান্দার জন্য আখেরাতে কোনো কল্যাণ নেই, তেমনিভাবে পার্থিব জীবনেও তার কোনো মঙ্গল নেই। আর মানুষ শরয়ি নির্দেশনা মানতে বাধ্য। কেননা মানুষের মাঝে দুটি প্রবাহ কাজ করে; একটির মাধ্যমে মানুষ উপকারী বিষয়াদি কাছে টেনে আনে, অপরটির সাহায্যে অপকারী বিষয় এড়িয়ে চলে। আর শরিয়ত হলো সেই নুর, যার মাধ্যমে ভালো-মন্দ বিষয়াদি সুস্পষ্ট হয়। শরিয়ত হচ্ছে ধরাপৃষ্ঠের জ্যোতি, মানুষের মধ্যকার ইনসাফের বাতি এবং এমন এক দুর্গ, যে এতে প্রবেশ করবে, নিরাপদ থাকবে।'

মানুষের অনুভূতির ভালো-মন্দ নির্ধারণ করা শরিয়তের উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অনুভূতিশক্তি দিয়ে তো বাকহীন চতুষ্পদ প্রাণীও বিভিন্ন জিনিসের পার্থক্য করে থাকে। গাধা ও উট মাটি ও যবের ব্যবধান অনুভূতির দ্বারাই করে। বরং শরিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের লাভ-ক্ষতির প্যারামিটারে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করা। যেমন, ঈমান, তাওহিদের উপকারিতা, ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা,

---

[২১] মাজমাউল ফাতওয়া : ৩/১১৩, ১১৪

সাদকা, ইহসান, সততা, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা, সহনশীলতা, ধৈর্য, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধাপ্রদান, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার, ভৃত্য ও প্রতিবেশীদের সাথে ভালো আচরণ এবং তাদের অধিকার আদায় করা, আমলের পাবন্দি শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া, আল্লাহর উপর ভরসা করা, তার কাছেই সাহায্য চাওয়া, তার বণ্টননীতি সহাস্যবদনে মেনে নেওয়া, তার হুকুম তামিল করা, আদেশসমূহের আনুগত্য করা, বন্ধুদের সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রাখা, শত্রুদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং কোনো বিষয়ে সাক্ষ্যদানে আল্লাহকে ভয় করা, বিধান পালনের ক্ষেত্রে খোদাভীতি লালন করা, হারাম ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকা, তার কাছে প্রতিদানের প্রত্যাশা করা, তাকে স্বীকার করা, নবীগণের প্রদত্ত সংবাদের ব্যাপারে তাদের সত্যায়ন করা, তারা যে ব্যাপারে আদেশ করেছেন তার আনুগত্য করা—উপর্যুক্ত যাবতীয় বিষয়ে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও সফলতা। এর বিপরীতে আছে ইহকাল ও পরকালের অকল্যাণ ও ব্যর্থতা।

যদি রিসালাত তথা 'আল্লাহর বাণী' না হতো, তাহলে মানুষের বিবেক দুনিয়া-আখেরাতের লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণে কূলকিনারা পেতো না। বান্দার প্রতি রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত! বিরাট অনুগ্রহ! তিনি তাদের নিকট নবী পাঠিয়েছেন। নবীদের উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। যদি মহান প্রভু এমনটা না করতেন, মানবজাতি জীব-জন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণীর স্তরে অধঃপতিত হতো। বরং বলা চলে, এর চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হতো। যে আল্লাহর বিধানসমূহ আঁকড়ে ধরবে, এর উপর অবিচল থাকবে, সে সৃষ্টির সেরা বিবেচিত হবে। আর যে আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করবে, শরিয়তের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে, সে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে। তার অবস্থা কুকুর, শূকর ও চতুষ্পদ প্রাণী থেকেও নিকৃষ্ট হবে।[২২]

যখন শরয়ি বিধানের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হলো তখন শরিয়তের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও প্রতিভাত হলো, যাতে তারা আল্লাহর পছন্দসই বিধান মেনে ইবাদত করতে পারে। কিন্তু শিক্ষা অর্জন ছাড়া তো শরয়ি বিধান জানার পথ রুদ্ধ। এ কারণেই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এমন শিক্ষা অর্জন করা ফরজ, যা ব্যতিরেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা অসম্ভব।

সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যে ওয়াজিব ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করে এবং সেই অনুযায়ী আমল করে, যাতে আল্লাহর সাথে এরকম অবস্থায় সাক্ষাৎ লাভ

---

[২২] মাজমাউল ফাতওয়া : ১৯/ ৯৯, ১০০

করতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, দুনিয়া অস্থায়ী, যার ধ্বংস অনিবার্য আর আখেরাত চিরস্থায়ী। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের সময়ের একজন মুমিনের তার কওমের প্রতি দাওয়াতের ভাষার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

হে আমার কওম, এই পার্থিব জীবন কেবল উপভোগের বস্তু আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।[২৩]

আল্লাহ আরও বলেন :

مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানতো![২৪]

الْحَيَوَانُ। দ্বারা উদ্দেশ্য 'পরিপূর্ণ জীবন', অর্থাৎ, যারা আল্লাহর আনুগত্যের প্রশ্নে গাফেল ছিল, পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, নিশ্চিন্ত বসে ছিল; আল্লাহ যেমনটি বলেছেন, কেয়ামত দিবসে তারা বলবে :

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.

এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম! সেদিন তার শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দেবে না এবং তার বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ দেবে না।[২৫]

আল্লাহর ইরশাদ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي দ্বারা প্রমাণ হয়, পরকালের গৃহই সৌভাগ্যবানদের জন্য সারা জীবনের আবাস। যেমনিভাবে সেটা হতভাগাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির ঠিকানা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম —আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মর্যাদা তেমনি, যেমন তোমাদের কেউ তার আঙুল সমুদ্রে চুবিয়ে রাখে, তারপর লক্ষ করে আঙুলটি কতটুকু পানি নিয়ে ফেরে।[২৬]

---

[২৩] সুরা মুমিন, আয়াত ৩৯

[২৪] সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬৪

[২৫] সুরা ফাজর, আয়াত ২৩-২৬

[২৬] মুসলিম রহ. হাদিসটি মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

نام رسول الله ﷺ على حصير فقام و قد أثر في جنبه ' قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء ' فقال مالي و للدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح و تركها.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে উঠলে তার পিঠে চাটাইয়ের দাগ পরিলক্ষিত হলো। তখন আমরা বললাম, আল্লাহর রাসুল, যদি চান আমরা নরম বিছানার ব্যবস্থা করি! রাসুলুল্লাহ বললেন, 'দুনিয়াবাসীর কী হলো, আমার অবস্থান তো দুনিয়াতে একজন মুসাফিরের ন্যায়, যে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেয় আবার চলতে শুরু করে।[২৭]

এই হলো দুনিয়ার প্রকৃত বাস্তবতা এবং এর মর্যাদা।

বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যে এমন দীনি ইলম অর্জনে সচেষ্ট হয়, যেই ইলমের মাধ্যমে সে ইহকালে সহিহ-শুদ্ধরূপে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে; তাহলেই সে আখেরাতে চিরস্থায়ীভাবে সফল হবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বস্তুগত ফায়দার জন্য পুথিগত বিদ্যা অর্জনের পেছনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে, অঢেল সম্পদ খরচ করে; অথচ তাদের এইসব ছেড়ে একদিন অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। তারা কিছু সময় ও সামান্য সম্পদ দীনি ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করার চিন্তা-ফিকির করে না, যাতে তারা পরকালে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। তারাই হলো অলস-অকর্মণ্য। সুতরাং তোমরা তাদের দলভুক্ত হয়ো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ.

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতির খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।[২৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন—'অধিকাংশ মানুষ বস্তুবাদী জ্ঞান, পার্থিব উপার্জন এবং দুনিয়াবি যাবতীয় বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখে; দুনিয়া কীভাবে হাসিল হয়, উপার্জনপ্রক্রিয়া কেমন হতে পারে- এসব ব্যাপারে তারা বেশ সতর্ক-সচেতন; অথচ দীনি বিষয়ে তারা একেবারে উদাসীন।

---

[২৭] ইমাম তিরমিযি রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ। আর 'وطاء' অর্থ কোমল বিছানা।

[২৮] সুরা রুম, আয়াত ৬, ৭

আখেরাতে কোন জিনিস তাদের জন্য উপকারী হবে সে ব্যাপারে এতোটাই উদাসীন ও অমনোযোগী, যেন চিন্তা-ফিকির বলতে কিছুই নেই।

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন—'তাদের অনেকেই দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, টাকাপয়সা হাতে নাড়াচাড়া করতে থাকে, তোমাকে উপার্জিত ধনদৌলতের ব্যাপারে অবহিত করে; অথচ সে নামাজটাও সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে না।'[২৯]

[২৯] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/৪২৭ (দারুল মারেফা)।

কথা ও কাজ শুরু করার আগে ইলম শিক্ষা করা ওয়াজিব এবং ইলম ছাড়া কথা ও কাজে মনোনিবেশ করা হারাম

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই পার্থিব জীবনে মানুষের জন্য শরিয়তের প্রয়োজন কতটুকু তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো। আরও বোঝা গেল যে, ইলম অর্জন ব্যতিরেকে শরিয়ত জানার কোনো পন্থা নেই। সুতরাং এখানে আমরা আল্লাহ চাইলে এ বিষয়টি স্পষ্ট করব—এই ইলম কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয় যে, যার ইচ্ছে হবে অর্জন করবে, মন চাইলে বাদ দেবে। বরং বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এই ইলম শিক্ষা করা ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহর হুকুম না জেনে কোনো কথা ও কাজে মশগুল হওয়া মুসলমানের জন্য হারাম। মুসলমান তার চাহিদামাফিক কাজে অগ্রসর হবে বিচক্ষণতার সাথে, জ্ঞাতসারে। তাই যেকোনো কথা ও কাজের পূর্বে তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। একজন মুকাল্লাফ ব্যক্তির[৩০] জন্য সর্বাগ্রে ঈমানে মুজমাল-এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, আমল সহিহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য যা পূর্বশর্ত। ঈমানে মুজমাল শিখলে ইলম অর্জনের অপরিহার্যতার বিষয়টি সামনে আসে। কারণ, যে মানুষটি মুসলিম হতে চায়, প্রথমেই তার জন্য ওয়াজিব হয় ঈমানে মুজমাল তথা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা। বিশ্বাস স্থাপন করা। এই প্রকারের ঈমানকেই 'ইকরার বিশ শাহাদাহ' (দুই সাক্ষ্যের স্বীকারোক্তি) নামে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে বান্দার উপর আবশ্যক হয় ঈমানের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করা, যার উপর আমল করা ওয়াজিব। আর তা জানতে হয় ঈমানে মুফাসসাল (বিস্তারিত স্বীকারোক্তি) এর মাধ্যমে। ফলে ইলম অর্জনের বিষয়টি যেন ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাসসালের মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ দিচ্ছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা উপর্যুক্ত বক্তব্যটি আরও স্পষ্ট করে; তিনি মুয়াজকে বলেন : 'যখন তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাবে, তাদের এ কালেমার দাওয়াত দেবে- আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি

---

[৩০] মুকাল্লাফ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, বিভিন্ন শর্তশারায়েত (যেমন মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া ইত্যাদি) এর ভিত্তিতে যার উপর শরিয়তের দায়িত্ব বর্তায়।

(মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসুল। যদি তারা এই দাওয়াত মেনে নেয়, তাদের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সংবাদ দেবে, যা আল্লাহ তাদের উপর ফরজ করেছেন। যদি এটাও তারা মেনে নেয়, তাদের বলবে, আল্লাহ তাদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন, যা ধনীদের থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তবে জাকাত নেওয়ার ক্ষেত্রে একান্তই তাদের উত্তম সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। মজলুমদের বদদোয়ার ভয় করবে। কেননা, তাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।'[৩১]

সুতরাং শাহাদাতাইন তথা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়ার দাবি হচ্ছে ঈমানে মুজমাল। আর নামাজ, জাকাতসহ অন্যান্য বিষয়ের পাবন্দি করা হচ্ছে ঈমানে মুফাসসাল। ইলম হলো উভয়ের মাঝে সেতুবন্ধন। নবীজির বাণী 'তুমি তাদের সংবাদ দেবে, আল্লাহ তাদের উপর ফরজ করেছেন'- দ্বারা ইলমের এই মধ্যস্থতাকারী ভূমিকাটিই বুঝে আসে। ইলম শিক্ষা করা আবশ্যক—এর প্রেক্ষাপট শুরু হয় ঈমানে মুজমালের পরে, ঈমানে মুফাসসালের আগে (অর্থাৎ প্রথমে ঈমানের সাক্ষ্যদান, তারপর ইলম অর্জন, তারপর আমল)।

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর চিন্তার গভীরতা প্রতিভাত হয় তার রচিত সহিহ বুখারি কিতাবের বিষয়বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে। তিনি 'ওহি' অধ্যায় দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন; বুঝাতে চেয়েছেন- ওহির মাধ্যমে দীন শিখতে হবে, আকল খাটিয়ে নয়। এরপর তিনি ঈমানের অধ্যায় নিয়ে এসেছেন; কারণ, বান্দার উপর প্রথমে ঈমান আনা আবশ্যক হয়। ঈমানের পর ইলমের আলোচনা টেনেছেন; কারণ, ইলমের মাধ্যমে ঈমানের অন্তর্নিহিত বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং বান্দার উপর অর্পিত আমল সম্পর্কে অবগতি লাভ হয়। ঈমানের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিস্তারিতভাবে ঈমানের অনুষঙ্গগুলো বর্ণনা করেছেন, তারপর পবিত্রতার অধ্যায় শুরু করেছেন, এরপর সালাত। কারণ, সালাত হলো ফরজে আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান। প্রথমে বান্দার থেকে সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ ইলমকে ঈমানে মুজমাল ও মুফাসসালের মাঝে সেতুর ভূমিকায় চিত্রায়িত করেছেন, মুয়াজ ইবনে জাবালের হাদিস যার প্রতি সমর্থন যুগিয়েছে। তবে এরকম বোঝার কোনো সুযোগ নেই যে, ঈমান সহিহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইলম শর্ত; বরং পরিশুদ্ধ ঈমানের জন্য ইলম শর্ত। আসলাফ-আকাবির বলেন—'ঈমান হলো কথা ও কাজ, যা বাড়ে ও কমে।[৩২]

---

[৩১] হাদিসটি বুখারি-মুসলিম উভয়টিতে আছে। তবে এখানে হাদিসের শব্দটি মুসলিমের।

[৩২] সালাফদের মাঝে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে, যা অনেকটা আক্ষরিক। প্রাসঙ্গিক নয় বিধায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।

'কথা' দ্বারা মাকসাদ হলো হৃদয়ের অভিব্যক্তি এবং মুখের ভাষা। আর হৃদয়ের অভিব্যক্তি হলো, হৃদয়ের গভীর থেকে জানা এবং জানাকে স্বীকৃতি দেওয়া। ফলে সংক্ষিপ্তভাবে যে বিষয়ের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব- তা জানা নির্ভেজাল ঈমানের পূর্বশর্ত।

সামনে আমরা কথা ও কাজের আগে ইলম শিক্ষা করা ওয়াজিব- এর প্রমাণে কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। নিম্নে বর্ণিত সুরতে তা আলোচিত হচ্ছে :

কুরআন থেকে দলিল

প্রসঙ্গত না জেনে কথা বলা, না বুঝে কোনো কাজে জড়ানো হারাম। কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা অশ্লীল বিষয় হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য; এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়-অত্যাচার এবং আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, যার কোনো সনদ তিনি অবতীর্ণ করেননি; এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।[৩৩]

না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা হারাম- আলোচ্য আয়াতটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং আয়াতে রয়েছে- এমন আলেম বিচারক মুফতি এবং আল্লাহর দীনের প্রচারকারী সকলের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা, যারা না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলে বেড়ায়। বাহ্যিক অর্থে আয়াতটির মাধ্যমে কথা ও কাজের আগে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক, সুস্পষ্টভাবে তা প্রতীয়মান হয়। যেমন, শিক্ষাদান করা, মামলা-মোকাদ্দমার ফয়সালা করা এবং ফতোয়া দেওয়া।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, এই নিষেধাজ্ঞামূলক বিধান উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হওয়া এটা শয়তানের প্ররোচনার অংশ । এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন—'তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো তোমাদের এ নির্দেশই দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যা আরোপ কর, যা তোমরা জান না।'[৩৪]

---

[৩৩] সুরা আরাফ, আয়াত ৩৩

[৩৪] সুরা বাকারা, আয়াত ১৬৮, ১৬৯

অনুরূপ আরও আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'কতক মানুষ অজ্ঞাতসারে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে, যেকেউ তার সাথি হবে, শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোজখের আজাবের দিকে পরিচালিত করবে।'[৩৫]

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়- অজ্ঞাতসারে বিতর্কে জড়ানো শয়তানি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা এর পরিণাম মন্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রব্বে কারিম ইরশাদ করেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৬]

وَلَا تَقْفُ অর্থ, যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ সালাফদের উদ্ধৃতি টেনে বলেন- তাদের আলোচনার সারমর্ম হলো, আল্লাহ তায়ালা 'জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কথা বলতে নিষেধ করেছেন; এমনকি দ্বিধা-সংশয় এবং ধারণার বশীভূত হয়েও (কথা বলতে নিষেধ করেছে)।

كُلُّ أُولَئِكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর। أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا মানুষ কেয়ামতের দিন উপর্যুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তার সম্পর্কে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং দেহাঙ্গ ব্যবহার করে সে যেসব কাজ সম্পাদন করেছে, এর ব্যাপারেও জবাবদিহি করা হবে।[৩৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না; তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল।[৩৮]

---

[৩৫] সুরা হজ, আয়াত ৩, ৪
[৩৬] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৬
[৩৭] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/৩৯
[৩৮] সুরা নুর, আয়াত ১৫

আল্লাহ তায়ালা না জেনে কথা বলার নিন্দা করেছেন; 'তোমরা মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার জ্ঞান তোমাদের ছিল না।' রব্বে কারিম ঘোষণা করেছেন—'অজান্তে কথা বলা যদি-বা মানুষের স্বভাব; কিন্তু আল্লাহর কাছে তা সাংঘাতিক ব্যাপার!' আয়াতটি যদিও 'ইফক'-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে, তথাপি মুখ্য বিষয় হচ্ছে শাব্দিক ব্যাপকতা (গত-অনাগত সবার জন্য প্রযোজ্য)।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

শোন! ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তা-ই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ?[৩৯]

ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন—'অজানা বিষয়ে বাগবিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া নিষেধ'— এ ব্যাপারে আয়াতটি প্রমাণস্বরূপ এসেছে। আর নিষেধাজ্ঞাটা ওই ব্যক্তির উপর, যার কাছে সুনিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। বক্তব্যের শেষদিকে তিনি বলেন— তর্কবিতর্ক করবে ওই ব্যক্তি, যে জানে এবং নিশ্চিতরূপেই জানে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন—'উত্তম উপায়ে তোমরা তাদের সাথে বিতর্ক কর।'[৪০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৪১]

ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—'তোমরা আল্লাহর হুকুমের মোকাবেলায় নিজেদের বক্তব্য ও কাজকর্ম অগ্রগণ্য করো না। দীনি ও দুনিয়াবি বিষয়ে রাসুলের বক্তব্য ও তার কর্মকে—যা তোমাদের জন্য অবশ্যপালনীয়—নিজেদের বক্তব্য ও কর্মের উপর প্রাধান্য দিয়ো না।' যে ব্যক্তি স্বীয় বক্তব্য ও কর্ম রাসুলের উপর অগ্রাধিকার দিল, সে যেন আল্লাহর উপর

---

[৩৯] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৬

[৪০] তাফসিরে কুরতুবি : ৪/১০৮

[৪১] সুরা হুজুরাত, আয়াত ১

নিজের প্রভুত্ব কায়েম করল। কারণ, রাসুল তো আল্লাহর বিধিনিষেধ পালন করতেই পথনির্দেশ করে থাকেন।[৪২]

আল্লাহর হুকুম ও রাসুলের আনীত শরিয়ত জানার পূর্বে কথা বলা কিংবা আমলের প্রতি মনোনিবেশ করা হারাম- এ মর্মে আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন—'শরিয়ত-প্রণেতার বক্তব্যপ্রদানের আগে তোমরা কথা বলবে না। আদেশ আসা পর্যন্ত কাউকে কোনো বিষয়ে আদেশ করবে না। ফতোয়া দিতে যাবে না, যে যাবত তিনি ফতোয়া না দিচ্ছেন। তিনি কোনো বিষয়ের ফয়সালা করা এবং তা বহাল রাখার সিদ্ধান্তে যতক্ষণ না যাবেন, ততক্ষণ কোনো বিষয় চূড়ান্ত ভাববে না। আলী ইবনে আবি তালহার সূত্রে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, তোমরা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কথা বলো না। আওফি রহিমাহুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেন, ইবনে আব্বাস বলেন—'তারা রাসুলের কথার উপর কথা না বলার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন।'

উপর্যুক্ত আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার সারবত্তা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলা কিংবা কোনো কাজ করার আগেভাগেই তোমরা কোনো কিছু বলতে বা কোনো কাজ করতে তড়িঘড়ি করবে না।[৪৩]

এইসব গুণের কারণে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাদের শানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ইরশাদ করেন—'বরং তারা তার সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তার আদেশেই কাজ করে।'[৪৪]

তারা প্রভুর বাণীর সামনে নিজেদের কথা অগ্রগামী করে না এবং আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কোনো কাজে মনোনিবেশ করে না। ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন—'তারা কথা-কাজে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করে থাকে। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; বরং তারা তার আদেশেই কাজ করে। অর্থাৎ তারা প্রভুর আদেশের সামনে কোনো বয়ান নিয়ে হাজির হয় না এবং তার আদিষ্ট বিষয়ে বিরোধিতার হাত বাড়ায় না। বরং তারা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে প্রভুর আদিষ্ট কর্মসম্পাদনে অগ্রসর হয়।'[৪৫]

---

[৪২] তাফসিরে কুরতুবি : ১৬/৩০০
[৪৩] ইলামুল মুআক্কিন : ১/৫১
[৪৪] সুরা আমবিয়া, আয়াত ২৬, ২৭
[৪৫] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/১৭৬

রবের কারিম ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের স্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।[৪৬]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন—'নবীজির উপর তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হওয়াটা যখন তাদের আমলের অধোগতির কারণ হয়, তখন তাদের অবস্থা চিন্তা করুন, যারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধি-বিবেচনা, মন-মানসিকতা, রাজনীতি-দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞান নবীজির আনীত বিধানের উপর অগ্রাধিকার দেয়, মর্যাদাপন্ন মনে করে! তাদের আমল সমূলে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য এটা কি অধিকতর বিপজ্জনক নয়!'[৪৭]

মহান রবের বাণী :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ

মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসুলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে শরিক হলে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না।[৪৮]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন—'যখন মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি পেতে অনিবার্যতার দাবি হিসেবে এ বিষয়টি নির্ণীত হলো যে, নবীজির সাহচর্যে থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ব্যতীত কোনো পথ গ্রহণ করবে না, তখন তো মুমিনের জন্য এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা নবী আলাইহিস সালামের সম্মতি ছাড়া কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক মতাদর্শ গ্রহণ করবে না। আর কোন বিষয়ে তার সম্মতি আছে আর কোথায় নেই তা বুঝতে নবীজির আনীত বিধানের দ্বারস্থ হবে।'[৪৯]

আসলে কোন বিষয়টি সিদ্ধ আর কোনটা নিষিদ্ধ, সেই মত ও পথ অবলম্বনের আগেভাগেই জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তা জেনে নেওয়া জরুরি।

---

[৪৬] সুরা হুজুরাত, আয়াত ২

[৪৭] ইলামুল মুআক্কিন : ১/৫১

[৪৮] সুরা নুর, আয়াত ৬২

[৪৯] ইলামুল মুআক্কিন : ১/৫১

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।[৫০]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন—'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এ মর্মে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আল্লাহ ও তার রাসুল সা.-এর ফয়সালাকৃত বিষয়ে কোনো মুমিনের অধিকার নেই আপত্তি করার! যে আপত্তি করবে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে পতিত হবে।'[৫১]

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি কাজকর্মে মনোনিবেশ করার পূর্বে সে ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসুলের মীমাংসিত বিধান জেনে নেওয়া ওয়াজিব, যাতে মানুষ স্বীয় চাহিদার বশীভূত হয়ে কোনো কাজে অগ্রসর না হয়; বরং আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুমের উপর ভরসা করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও যদি তোমরা না জেনে থাক।[৫২]

আল্লাহ তায়ালা যারা জানে না তাদেরকে আলেমদের থেকে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়ার আদেশ করেছেন। সুতরাং আয়াতটির মাধ্যমে কথা ও কাজ শুরু করার পূর্বে জ্ঞানার্জন ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আলেমগণও ঐকমত্য পোষণ করেছেন- দীনের জরুরি বিষয়াদিতে সাধারণের জন্য আবশ্যক হলো, আলেমদের থেকে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া। আবু আমর ইবনে আবদুল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন—'এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত; আলেমদের তাকলিদ তথা অনুসরণ করা সাধারণ জনগণের জন্য ওয়াজিব এবং আল্লাহর বাণী فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (তোমরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও যদি তোমরা না জেনে থাক) দ্বারা এরাই উদ্দিষ্ট।'[৫৩] খতিব বাগদাদি রহিমাহুল্লাহও তার *আল-ফাকিহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ* গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫৪]

---

[৫০] সুরা আহযাব, আয়াত ৩৬

[৫১] ইলামুল মুআক্কিন : ১/৫১

[৫২] সুরা নাহল, আয়াত ৪৩; সুরা আমবিয়া, আয়াত ৭

[৫৩] জামিউ বয়ানিল ইলমি : ২/১১৫

[৫৪] আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ : ২/৬৮

সুন্নাহ থেকে দলিল

প্রসঙ্গ না জেনে কথা বলা, না বুঝে কোনো কাজে জড়ানো হারাম। কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব।

১। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ সহিহ বুখারির 'ইলম অধ্যায়ে' একটি শিরোনাম উল্লেখ করেছেন :

العلم قبل القول و العمل 'لقول الله تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فبدأ بالعلم.

কথা ও কাজের পূর্বে ইলম অর্জন করা জরুরি। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।' আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইলম দ্বারা কথা শুরু করেছেন।

ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ ইবনুল মুনায়্যির রহিমাহুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—'ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ এর মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন, কথা ও কাজের শুদ্ধতার জন্য ইলম পূর্বশর্ত। ইলম ব্যতিরেকে কথা ও কাজের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই ইলম অগ্রণী ভূমিকায় থাকে। কেননা, আমলের শুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল আর সেই নিয়ত পরিশোধন করে ইলম।'[৫৫]

ইলম শুধু নিয়তই পরিশুদ্ধ করে না; বরং 'মুতাবাআত'কেও পরিশোধন করে। কারণ, আমল কবুলের শর্ত দুটি; 'ইখলাস—যেকোনো কাজ করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। তিনি একক। তার কোনো অংশীদার নেই। মুতাবাআত—গুণগত ক্ষেত্রে আমলটা শরিয়তের বিধান মোতাবেক হওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?'[৫৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ أَحْسَنُ عَمَلًا-এর ব্যাখ্যায় ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে বয়ান করেন, তিনি বলেন—'কর্মে শ্রেষ্ঠ' এর অর্থ ইখলাস ও বিশুদ্ধতায় যার আমল শ্রেষ্ঠ। 'ইখলাসের মূলকথা হলো নিয়তের স্বচ্ছতা। 'বিশুদ্ধতা'র দাবি হলো 'মুতাবাআত' তথা আমলটা গুণগত ক্ষেত্রে শরিয়ত মোতাবেক হওয়া। আর নিয়তের শুদ্ধতা ও মুতাবাআতের পরিশুদ্ধতার জন্য ইলম আবশ্যক। সামনের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

---

[৫৫] ফাতহুল বারি : ১/১৫৯, ১৬০

[৫৬] সুরা মুলক, আয়াত ২

নবী আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন :

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

যে ব্যক্তি আমার নির্দেশিত আমল ভিন্ন অন্য আমল করবে, তার সেই আমল প্রত্যাখ্যাত হবে।[৫৭]

উপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা যে জিনিসটি পরিস্ফুট হয়, তা হলো- যার আমলই শরিয়তের খেলাফ হবে, তা অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত হবে, যা মুতাবাআতের জন্য শর্ত। এ ছাড়া 'আমলের পূর্বে ইলম অর্জন করা ওয়াজিব' হাদিসটি এ বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত বহন করে, যাতে আমলটি সহিহ-শুদ্ধ ও শরিয়ত মোতাবেক হয়। এর ব্যত্যয় ঘটলে তা বাতিল ও বর্জিত হবে, আমলকারীর জিম্মামুক্ত হতে তা যথেষ্ট হবে না।

ইসলামের ভিত্তি যে সমস্ত হাদিসের উপর নির্ভরশীল, আলোচ্য হাদিসটি তারই অন্তর্ভুক্ত। তাই তো ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ 'চল্লিশ হাদিস' কিতাবে হাদিসটি স্থান দিয়েছেন।[৫৮]

গবেষক আলেমগণ (দীনি ক্ষেত্রে) নতুন সৃষ্ট বিষয়কে বাতিলীকরণে দলিল হিসেবে এই হাদিস উল্লেখ করে থাকেন।

'বিচারকের রায় এবং মুফতির ফতোয়া', শরিয়ত বিরোধী হলে বাতিলযোগ্য বিবেচিত হবে, যার প্রমাণ এই হাদিস; যদিও উনারা মুজতাহিদ পর্যায়ের হোন না কেন। এমনটিই ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ *সহিহ বুখারির* 'আহকাম ও ই'তিসাম' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[৫৯]

সন্ধিপত্র ও চুক্তিনামা এবং এজাতীয় যে-সমস্ত লেনদেন রয়েছে, শরিয়ত মোতাবেক না হলে উক্ত হাদিসের আলোকে তা বাতিল বিবেচিত হবে। বুখারি রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়টি *সহিহ বুখারির* 'সুলাহ' অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।[৬০]

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ 'ইতিসাম' অধ্যায়ে একটি শিরোনাম উল্লেখ করেছেন :

باب ما كان النبي ﷺ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، فيقول: «لا أدري»، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: {بما أراك الله} [النساء: ١٠٥] وقال ابن مسعود: سئل النبي ﷺ عن الروح فسكت حتى نزلت الآية

---

[৫৭] হাদিসটি ইমাম মুসলিম হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন। বুখারি রহ. হাদিসটি 'মুআল্লাক' সূত্রে উল্লেখ করেন এবং তিনি এরকম একটি হাদিস কাছাকাছি শব্দে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন।

[৫৮] কিতাবটির নাম; 'আল-আরবাউনা আন-নবাবিয়্যাহ'।

[৫৯] ফাতহুল বারি : ১৩/১৮১, ৩১৭

[৬০] ফাতহুল বারি : ৫ / ৩০১, ৩০৩

ওহি অবতীর্ণ হয়নি এমন বিষয়ে নবী আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, 'আমি জানি না' কিংবা 'তিনি কোনো উত্তর দিতেন না', অবশেষে ওহি অবতীর্ণ হতো। তিনি নিজের থেকে যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু বলতেন না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন—'যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান'। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- নবী আলাইহিস সালামকে 'রুহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি নীরব থাকেন। পরিশেষে আয়াত নাজিল হলো।...

উক্ত শিরোনাম উল্লেখ করার পর বুখারি রহিমাহুল্লাহ 'কালালা' সম্পর্কে নাজিলকৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় জাবেরের হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৬১] শিরোনামটির দ্বারা কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জন ওয়াজিব—এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

ইমাম আবু দাউদ রহ. জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন :

عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو» يعصب «شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা এক সফরে ছিলাম। আমাদের এক সাথির মাথায় একটি পাথরের আঘাত লাগায় তার মাথা ফেটে গেল। এরপর একপর্যায়ে তার বীর্যপাত হলো। সে তার সাথিদের কাছে জানতে চাইল তার জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ আছে কি না? তারা জানাল, তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম, তোমার জন্য তায়াম্মুমের অবকাশ নেই। অতঃপর সে গোসল করতে গিয়ে মারা গেল। (জাবের বলেন) আমরা যখন নবীজির কাছে এলাম, তাকে তখন বিষয়টি অবগত করলাম। তিনি বললেন, তারা তাকে ধ্বংস করে ফেলেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুক। তারা না জেনে থাকলে কেন জিজ্ঞেস করে সমাধান জেনে নিল না! অজ্ঞতার আরোগ্য তো হলো প্রশ্ন করা। ওই ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল শুধু

[৬১] ফাতহুল বারি : ১৩/ ২৯০

তায়াম্মুম করে নেওয়া এবং জখমের উপর কাপড়ের পট্টি বেঁধে রাখা।[৬২] এরপর তার উপর মাসেহ করে সমস্ত শরীর ধৌত করে নেওয়া।'[৬৩]

العي মানে 'অজ্ঞতা'। আলোচ্য হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না জেনে ফতোয়া দেওয়ার কারণে তাদের তিরস্কার করেছেন। বদদোয়া করে তাদের ভয় দেখিয়েছেন। লোকটি মারা যাওয়ায় তাদেরকে গুনাহগার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। খাত্তাবি রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি *মা'আলিমুস-সুনান* কিতাবে উল্লেখ করেছেন। কথা বলা ও কাজে লিপ্ত হওয়ার আগে ইলম অর্জন যে একটি অনস্বীকার্য বিষয়- এই হাদিস তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। হাদিসে উল্লেখিত 'তিরস্কার ও ভীতিপ্রদর্শন' দ্বারা এটাও সুস্পষ্ট যে, 'না জেনে, না বুঝে' যেকোনো মত ও পথ অবলম্বন করা হারাম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—দুনিয়াতে চার শ্রেণির মানুষ রয়েছে :

এক. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান ও সম্পদের মতো দৌলত দান করেছেন। সে এর ব্যবহারে আল্লাহকে ভয় করে। আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। প্রদত্ত দৌলতে আল্লাহর হক জানে। সে হলো, মর্যাদার স্তরে সর্বোত্তম।

দুই. আল্লাহর এমন বান্দা, যাকে তিনি শুধু ইলম দিয়েছেন, সম্পদ দেননি। তবে ব্যক্তিটি পরিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী। সে কামনা করে বলে, যদি আমার সম্পদ থাকত, আমি অমুকের (প্রথম ব্যক্তির) মতো পুণ্যের কাজ করতাম। তাহলে সে তার নিয়তের অনুরূপ সাওয়াব পেয়ে যাবে। প্রতিদানের বিবেচনায় তারা উভয়ই সমান হকদার হবে।

তিন. যে ব্যক্তিকে রব্বে কারিম সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু ইলম নামক দৌলত প্রদান করেননি; সে স্বীয় ধনসম্পদকে অজ্ঞতাবশত হারামের সাথে সংমিশ্রণ ঘটায়, এ ব্যাপারে মহান প্রভুকে ভয় করে না; আত্মীয়তার হক আদায়ে যত্নশীল হয় না এবং রবের হকের ব্যাপারে মনোযোগী নয়—সে মন্দত্বের দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের।

চার. এমন বান্দা, যাকে সম্পদ ইলম কিছুই প্রদান করেননি। সে বলে থাকে, যদি আমার ধনদৌলত থাকত, আমি অমুকের মতো আমল (সম্পদ পুঞ্জীভূত)

---

[৬২] মুসা ইবনে আবদুর রহমানের শব্দ নিয়ে সন্দেহ আছে। হাদিসের শব্দটি يعصر হবে নাকি يعصب হবে, তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন।

[৬৩] হাদিসটি আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

করতাম। তার প্রতিবিধান নিয়ত অনুযায়ীই করা হবে। গুনাহের বোঝা বহনের দিক থেকে তারা উভয়ই (তৃতীয় ও চতুর্থ) সমান ভাগীদার হবে।[৬৪]

*ইবনে মাজাহ*তেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লেখ আছে; নবী আলাইহিস সালাম বলেন—'এই উম্মতের দৃষ্টান্ত হলো চারশ্রেণির মানুষের মতো'। ইমাম তিরমিযি ও ইমাম ইবনে মাজাহ তারা উভয়েই হাদিসটি আবু কাবশা আল-আনমারি থেকে বর্ণনা করেছেন।

উপর্যুক্ত হাদিসে নবী আলাইহিস সালাম দু'শ্রেণির মানুষের প্রশংসা করেছেন এবং দু'শ্রেণির মানুষের নিন্দা করেছেন।

যে ইলমের দাবি অনুসারে ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তার প্রশংসা করেছেন 'মর্যাদার স্তরে সর্বোত্তম' বলে। যেমন গুণকীর্তন করেছেন 'মর্যাদার স্তরে দ্বিতীয়' বলে- এমন ব্যক্তিকে যে ইলম অনুপাতে কথা বলে।

আর যে মূর্খতাবশত নিজের সম্পদকে হারাম মালের সাথে মিশ্রণ ঘটায়, তাকে তিরস্কার করতে গিয়ে নবী বলেন—'সে মন্দত্বের দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের'। যেমন নিন্দা করেছেন 'মন্দত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরের'- এমন ব্যক্তিকে, যে এমন বিষয়ে কথার অবতারণা করে, যে ব্যাপারে তার কোনো জ্ঞান নেই।

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞার সাথে কথা বলে ও কাজ করে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তারিফ করেছেন এবং যার কথাবার্তা ও কাজকর্মে রয়েছে জ্ঞানশূন্যতা, বরং মূর্খতা- তাকে ভর্ৎসনা করেছেন। পাপের উপযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'জাহালত'কে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেননি। কারণ, কথা ও কাজের পূর্বে ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অবহেলা করবে, তার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। সে গুনাহমুক্ত হবে না। বরং বলা চলে সে যেন পাপসাগরে নিমজ্জিত হলো।

সুতরাং উক্ত হাদিসের আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম- ইলম ছাড়া কোনো মত ও পথের দিকে পা বাড়ানো হারাম এবং এর পূর্বেই জ্ঞানার্জন ওয়াজিব।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—'বিচারক তিন ধরনের; একশ্রেণি হবে জান্নাতি। বাকি দুইশ্রেণি থাকবে জাহান্নামে। যে সত্য জেনে সেই অনুযায়ী ফয়সালা করে, তার অবস্থান জান্নাতে। আর যে সত্য জানার পরও অন্যায়ভাবে মামলা নিষ্পত্তি করে, তার আবাস জাহান্নাম। তৃতীয় শ্রেণি হলো,

---

[৬৪] তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং একে হাসান ও সহিহ-এর মধ্যে গণ্য করেন (২৪৪১)

এমন ব্যক্তি যে মূঢ় অবস্থায় বিচারকার্যের রায় প্রদান করে। সেও জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে।[৬৫]

যে সত্য জেনে ফয়সালা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গুণকীর্তন করেছেন। অন্যদিকে যে না জেনে অজ্ঞতাবশত বিচারকার্য পরিচালনা করে, তাকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন, নিন্দা করেছেন। অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে সে পার পাবে না। কারণ, বিচারকার্যে বসার আগে প্রয়োজনীয় ইলম অন্বেষণে সে গাফলতি করেছে। সুতরাং না জেনে কথা বলা ও কাজ করা যে হারাম এবং কথা ও কাজের আগে জ্ঞানার্জন ওয়াজিব- এই হাদিস তার প্রমাণ বহন করছে।

ইজমা (উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত)

প্রসঙ্গ না-জেনে কথা বলা, না-বুঝে কোনো কাজে জড়ানো হারাম। কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। শিহাবুদ্দীন কারাফি আল-মালেকি রহিমাহুল্লাহ তার *আল-ফুরুক* গ্রন্থের ৯৩ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন, 'ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন* কিতাবে ইজমা নকল করেছেন এবং শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ তার *আর-রিসালাহ*তে বর্ণনা করেছেন যে- ইবাদতের আদেশপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য জায়েজ নয় আল্লাহর বিধান না-জেনে কোনো কাজে অগ্রসর হওয়া। যে লেনদেন করবে, তার জন্য ওয়াজিব হলো লেনদেন সম্পর্কে আল্লাহর বিধান জেনে নেওয়া। যদি সে ভাড়া দিতে চায়, তাহলে ইজারা বিষয়ক আল্লাহ যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন, অবশ্যই তা জেনে নেবে। যে ঋণ সম্পর্কিত লেনদেন করতে চায়, ওয়াজিব হলো, ঋণ সম্পর্কিত শরয়ি নীতি সে জেনে নেবে। এরকমভাবে যে নামাজ আদায় করবে, নামাজের মাসায়েল তার জেনে নেওয়া জরুরি হবে। অনুরূপ বিধান পবিত্রতাসহ সকল কথা ও কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে ইলম শিক্ষা করল এবং তদনুযায়ী আমল করল, সে আল্লাহ তায়ালার দুটি বিধান পালন করল। আর যে ইলম শিক্ষা করল না, আমল করল না, সে মহান রবের দুটি নাফরমানি করল। অন্যদিকে যে ইলম অর্জন করল; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করল না, সে রব্বে কারিমের একটি বিধান মান্য করল বটে; কিন্তু আরেকটির অবাধ্যতা করল।

এই নীতির উৎস হিসেবে কুরআনের আয়াত দৃশ্যমান রয়েছে নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনায়। আল্লাহ বলেন :

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ

---

[৬৫] বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি সকলেই হাদিসটি বুরাইদা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

(হে আমার পালনকর্তা) আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৬৬]

অর্থাৎ কোনো জিনিস প্রার্থনার বৈধতার জন্য যে জ্ঞান থাকা দরকার, তা আমার নেই। সুতরাং বোঝা গেল, নুহ আলাইহিস সালামের জন্য সঠিক হয়নি; প্রার্থিত বিষয়ে আল্লাহর বিধান না-জেনে এবং প্রার্থনাটা তার জন্য উচিত কি উচিত নয়—না-বুঝেই দরখাস্ত করে বসা। এ কারণেই নুহ আলাইহিস সালামকে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা, তিনি নিজের সাথে ছেলেকে কিশতিতে তোলার বিষয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন; অথচ নিজের সন্তানের অবস্থা তার জানা ছিল না। এ ব্যাপারেও তিনি অবগত ছিলেন না যে- সন্তানের পক্ষে দরখাস্ত করা উচিত হবে কি না? (মহান রবের) ধমকি ও জবাব থেকে বিষয়টি সহজেই অনুমান করা যায় যে, মানুষ যে কাজের অবতারণা করতে চায়, সে বিষয়ে প্রথমেই ইলম অর্জন করে নেওয়া তার জন্য জরুরি।[৬৭]

যখন (উপর্যুক্ত আয়াত থেকে ইলমের প্রয়োজনীয়তার) বিষয়টি স্থির হলো, তখন আমরা আরেকটি আয়াতের দিকে লক্ষ করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না।[৬৮]

মহান রব তার নবীকে অজানা-অজ্ঞাত বিষয়ের পেছনে পড়তে বারণ করেছেন। তাই জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কোনো কাজের সূচনা করা জায়েজ হবে না। সর্বাবস্থায় ইলম অন্বেষণ করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ (ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ)।

ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন—'ইলম দু'প্রকার; ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া। তোমাদের বর্তমান অবস্থার বাস্তবানুগ জ্ঞান যে ইলম দ্বারা অর্জিত হয়, তা হলো ফরজে আইন। এর বাইরে যা রয়েছে, সবই ফরজে কেফায়া।[৬৯]

---

[৬৬] সুরা হুদ, আয়াত ৪৭

[৬৭] অবশ্য নুহ আলাইহিস সালাম সাথে সাথেই আল্লাহ তায়ালার কাছে বিনয়ের সাথে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। কুরআনের ভাষায় : নুহ বলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো। (সুরা হুদ, আয়াত ৪৭)

[৬৮] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৬

[৬৯] আল-ফুরুক : ২/১৪৮, ১৪৯ (দারুল মারেফা)।

সারকথা হলো, কুরআন-সুন্নাহর উপর্যুক্ত দলিল-প্রমাণ এবং কারাফির বর্ণিত ইজমা দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, না-জেনে কথা বলা, না-বুঝে কোনো কাজে জড়ানো হারাম। কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব।

কথা ও কাজের আগে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব; এবং অজ্ঞতা নিয়ে কথা বলা ও কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া হারাম- এই মূলনীতি সুপ্রমাণিত করার জন্য আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে অনেক দলিল উপস্থিত করেছি, যাতে মূলনীতিটা মুসলমানের মন-মগজে গ্রোথিত হয়ে যায়, নিজেরা সেটাকে আঁকড়ে ধরে এবং অন্যকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করে। দলিল-প্রমাণ ছাড়া তারা যেন কোনো কথা না-বলে, কোনো কাজের অবতারণা না-করে এবং শরিয়তের মানদণ্ড-উত্তীর্ণ নয় এমন কথা অন্যের থেকে গ্রহণ না-করে। এই মূলনীতি আঁকড়ে ধরার মধ্যে রয়েছে মহান রবের ইচ্ছায় মুসলিমদের জন্য বিরাট কল্যাণ; এবং বিদআতি, স্বেচ্ছাচারী ও পথভ্রষ্টদের জন্য সতর্কবার্তা, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর দীনের ব্যাপারে কথা বলে (আমরা শুধু আল্লাহর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করি)।

যখন তুমি বিষয়টি বুঝতে পেরেছ তখন তুমি হালজমানার অসংখ্য মুসলমানকে দেখতে পাবে, যারা প্রচণ্ড উদাসীনতায় নিমজ্জিত রয়েছে। তোমার সামনে পরিস্ফুট হবে; না-জেনে, জানার জন্য জিজ্ঞেস না-করে এবং হারাম-হালালের তোয়াক্কা না-করেই কাজকর্মে মশগুল হওয়ার বিভিন্ন চিত্র। অবস্থা এত নিচু স্তরে গিয়ে ঠেকেছে যে, মানুষ বছরের পর বছর রিজিক তালাশ করছে; কিন্তু হারাম-হালালের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছে না!

এই ব্যাধি শুধু জনসাধারণ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; অনেক আলেমের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে। তুমি তাদের দেখবে—ফতোয়া দিচ্ছে, কিতাব রচনা করছে এবং কোনোরূপ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই একটা বিষয় বৈধতার মোড়কে উপস্থাপন করছে, আবার কোনোটা নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে; বরং ক্ষেত্রবিশেষ যোগ্যতা ছাড়াই এরূপ করা হচ্ছে! আমরা ওই সমস্ত ব্যক্তির জন্য কঠোর ভীতিপ্রদর্শনের কথা উল্লেখ করেছি, যারা না-জেনে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। নিজেদের খেয়াল-খুশি দ্বারা মূর্খতাবশত মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহ্ বলেন—'তারা কি চিন্তা করে না যে, সেই মহাদিবসে তারা পুনরুত্থিত হবে!'[৭০]

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'তাদের দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।'[৭১]

---

[৭০] সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত ৪, ৫
[৭১] সুরা যুখরুফ, আয়াত ১৯

ধারণাপ্রসূত কথাবার্তা ও মনগড়া রায়-এর দরজা দিয়েই পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থাদিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

এক্ষেত্রে আমরা ভাই-বন্ধু, দীনের দায়ি, ওয়ায়েজ এবং শরয়ি জ্ঞানচর্চায় মগ্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ওসিয়ত করব; তারা যেন এই মাসআলা তাবৎ মুসলমানের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। জেনে রাখবে, মাসআলাটি হলো- 'না-জেনে কথা বলা, না-বুঝে কোনো কাজে জড়ানো হারাম। কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব।'

এই মাসআলা সর্বত্র বিস্তৃত হলে মুসলমানের মাঝে ইলম অন্বেষণের ফরজ বিধান জীবন্ত হবে। আর এটা প্রভূত কল্যাণের বিরাট দ্বার উন্মুক্ত হবে। বরং ইলম অর্জনের দরজা উন্মুক্ত হবে। ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তার *মিফতাহু দারিস সা'আদাহ* কিতাবে জ্ঞানার্জনের ফাযায়েল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—'আল্লাহর ইচ্ছায় ইলম অর্জন হলো জান্নাতস্বরূপ।'

ফায়দা : মানবকল্যাণে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত শরিয়ত পালন করা

মনে রাখবে, কথা বলা ও কাজ করার আগে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব- এই বক্তব্য যেমনভাবে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তদ্রূপ দল-গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের ব্যাপারেও প্রয়োগযোগ্য। আরও জেনে রাখবে! মানবতার কল্যাণে, দল-গোষ্ঠীর হিতকামনায় ও রাষ্ট্রের সুখসমৃদ্ধির জন্য কেয়ামত দিবস পর্যন্ত শরিয়ত পালন করার বিষয়টিও উপর্যুক্ত নীতির অন্তর্ভুক্ত—সেটা ইহজাগতিক কল্যাণ হোক কিংবা পরকালীন; সব বরাবর। যদি উক্ত কল্যাণ বাস্তবায়নে শরিয়ত পালন করতে গড়িমসি করা হয়, তাহলে 'কথা বলা ও কাজ করার আগে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব' নীতি মুখ থুবড়ে পড়বে। কেননা, শরিয়ত সম্পর্কিত প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানার্জন ওয়াজিব—বিষয়টির বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবার আগেই। অর্থাৎ শরিয়ত পালনে ব্রতী হওয়ার পূর্বেই।

কেয়ামত অবধি যে শরয়ি বিধিনিষেধ মানতে হবে—এ ব্যাপারে বহু দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে কিছু নিম্নরূপ :

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

আমি আপনার উপর কিতাব নাজিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা।[৭২]

---

[৭২] সুরা নাহল, আয়াত ৮৯

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

হে মুমিনগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, মান্য কর রাসুলের নির্দেশ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহর ও তার রাসুলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।[৭৩]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন—আলোচ্য فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ আয়াতাংশে শর্ত উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট শব্দ চয়ন করা হয়েছে, যা মুমিনদের মাঝে বিবদমান সূক্ষ্ম-অসূক্ষ্ম ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দীনি সকল মাসায়েল অন্তর্ভুক্ত করে। যদি আল্লাহর কিতাবে এবং রাসুলের হাদিসে বিবদমান বিষয়ের কোনো সুরাহা না থাকত কিংবা থাকলেও যথেষ্ট পরিমাণ না থাকত, তাহলে বান্দা কিতাবুল্লাহ ও রাসুলের সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আদিষ্ট হতো না। কারণ, এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, যার কাছে বিবাদের সমাধান নেই, কলহের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার শরণাপন্ন হতে আদেশ দেবেন।

সকলে এ ব্যাপারে একমত যে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ কিতাবুল্লাহর দ্বারস্থ হওয়া। রাসুলুল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, খোদ তার জীবনাচারের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া এবং তার রেখে যাওয়া সুন্নাহ ও আদর্শের প্রতি ধাবিত হওয়া।[৭৪]

মানবকল্যাণে কেয়ামত অবধি শরিয়ত পরিপালনের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন—'এটা গুরুত্বপূর্ণ; বরং উপকারী মূলনীতি। এর ভিত্তি একটি বিষয়ের উপর; রাসুলের সর্বজনীন রিসালাত এবং ইলম ও আমলের বাস্তবায়ন ঘটাতে যার প্রতি বান্দা মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। রিসালাত তথা নবী আলাইহিস সালামের আনীত বিধান তার উম্মতকে এর পর আর কারো দিকে মুখাপেক্ষী করে না। তবে হ্যাঁ, এই উম্মতকে—যার থেকে নববি বিধানের সংবাদ লাভ করবে তার শরণাপন্ন হতে হয়। সুতরাং নববি রিসালাতের দুটি সর্বজনীন দিক রয়েছে, যা কোনো কিছুর সাথে বিশেষায়িত হওয়া থেকে সংরক্ষিত :

---

[৭৩] সুরা নিসা, আয়াত ৫৯

[৭৪] ইলামুল মুআক্কিন : ১/৪৯

১. প্রেরিত ব্যক্তিবর্গের সর্বজনীনতা (নববি বিধান নির্বিচারে সকলের কাছে প্রেরিত হওয়া এবং সমগ্র মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবার ব্যাপকতা)।
২. আদেশপ্রাপ্ত বান্দারা যখন দীনের মৌলিক ও শাখাগত বিধানের মুখাপেক্ষী হবে, তখনি তার বিধান সে শরিয়তের মাঝে পেয়ে যাবে।

ফলে বোঝা গেল, নববি রিসালাত মানুষের জন্য যথেষ্ট, সন্তোষজনক ও ব্যাপক, যা ভিন্ন কোনো জীবনবিধানের দিকে মানুষকে মুখাপেক্ষী করে না। তাই রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার পূর্ণতা আসবে না, যতক্ষণ রিসালাতের সর্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতার উপর বিশ্বাস না আনবে। (যেহেতু সর্বজনীনতার গুণ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত) তাই ইবাদতের আদেশপ্রাপ্ত বান্দাদের প্রত্যেকেই নববি বিধান পালনে বাধ্য। নববি বিধানের বাইরে এমন কোনো সত্য নেই, যা অর্জন করতে এবং অর্জিত বিষয়কে আমলে পরিণত করতে উম্মাহ মুখাপেক্ষী হবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকাল করেছেন। তবে তার দেহপিঞ্জর এভাবেই ডানা ঝাপটিয়ে আসমানের প্রভুর সান্নিধ্যে মিলিত হয়নি; বরং (যাবার আগে) তিনি তার উম্মতের সাথে ইলমি আলোচনা করেছেন। তাদেরকে পেশাব-পায়খানার আদব, বিবাহ-সহবাস, চলাফেরা, ওঠাবসা, ঘুম ও পানাহারের সকল নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। বাহনে আরোহণ এবং তা থেকে অবতরণ, দূরদূরান্তে সফর এবং নিজ এলাকাতে বসবাস কীভাবে হবে, তার নিয়মনীতি শিখিয়েছেন। নীরব থাকা, কথা বলা, নির্জনতা অবলম্বন করা এবং যৌথভাবে থাকার ইসলামি রীতি তুলে ধরেছেন। বিত্তবান হলে কী করবে, দরিদ্র হলে করণীয় কী হবে, সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় কী করবে; সর্বোপরি তার জীবন-মৃত্যুর যাবতীয় বিধান রাসুল তার উম্মতকে শিক্ষা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি তার উম্মতের সামনে আরশ-কুরসির বিবরণ তুলে ধরেছেন। জিন-ফেরেশতা, জান্নাত-জাহান্নাম ও কেয়ামত দিবস এবং সেদিন যা ঘটবে তার বর্ণনা এমনভাবে আলোকপাত করেছেন, যেন তিনি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি তার উম্মতের সামনে তাদের রবের পরিপূর্ণ পরিচয় এমনভাবে প্রকাশ করেছেন, মনে হচ্ছে, তিনি মহান রবকে দেখতে পাচ্ছেন, রবকে তামাম গুণাবলি এবং মহিমান্বিত স্তুতির সাথে অবলোকন করছেন। পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের উম্মতের জীবনবৃত্তান্ত এবং তাদের প্রাপ্ত নেয়ামত ও আপতিত আপদ এমনভাবে উম্মতের সম্মুখে চিত্রিত করেছেন, যেন তার উম্মত সেকালে তাদের সাথে অবস্থান করছিল। নবী আলাইহিস সালাম ভালো-মন্দ ও ছোট-বড় পথ ও পদ্ধতির বিশদ আলোচনা করেছেন, যা ইতিপূর্বে কোনো নবী তার উম্মতের সামনে করেননি। মৃত্যুকালীন অবস্থা, তৎপরবর্তী আলমে বারযাখের হাল-হাকিকত, অতঃপর সেসকল শান্তি ও শাস্তি, যা রুহ ও শরীর ভোগ করবে- রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন; পূর্বের কোনো নবী তা দিতে সক্ষম হননি। এমনিভাবে নবী আলাইহিস সালাম একত্ববাদ, নবুওয়াত ও পুনরুত্থান দিবসের দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে উম্মতের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং সমগ্র কাফেরগোষ্ঠী ও গোমরাহ দলসমূহের বিভ্রান্তি এমন প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে খণ্ডন করেছেন; পরবর্তীতে কোনো ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয়বার খণ্ডনের প্রয়োজন পড়বে না। আল্লাহ পানাহ! তবে এমন ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে, যে নবীর বক্তব্য তাদের কাছে পৌঁছাবে, স্পষ্ট করবে এবং তাদের কাছে এর সংক্ষিপ্ত বিষয়াদি ব্যাখ্যা করবে। এরকমভাবে নবী আলাইহিস সালাম যুদ্ধ-প্রতারণা, শত্রু-সংঘর্ষ, সাহায্য ও বিজয় সম্পর্কিত নীতিমালা উম্মতের সামনে সুপ্রকাশিত করেছেন। যতদিন তারা নবী আলাইহিস সালামের নীতি-আদর্শ আঁকড়ে থাকবে, অনুধাবন করবে এবং এর প্রতি পরিপূর্ণ যত্নবান হবে, শত্রুপক্ষ কখনোই তাদের সামনে টিকতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে আরও অবহিত করেছেন; শয়তানের ষড়যন্ত্র এবং তার প্রতারণার নানা ধরন-পদ্ধতি, যা ব্যবহার করে সে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে, উম্মত কীভাবে শয়তানের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা থেকে বাঁচবে, নিকৃষ্ট মন্দকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে- সেই বিষয়েও তাদের অবহিত করেছেন। নিজেদের আত্মিক অবস্থা, আত্মার উৎকর্ষ, দিলের কূটনামি ও অন্তরের ব্যাধি বিষয়ক আলোচনা এতো বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন—ভবিষ্যতে তাদের জন্য নতুনভাবে এ বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পাশাপাশি উম্মতকে অবহিত করেছেন জীবিকা-নির্বাহসহ এমন কিছু বিষয়, যতদিন তারা তা ধারণ করবে, আমল করবে তাদের পার্থিব জীবন-জিন্দেগির চাকা ততদিন সচল থাকবে।

মোটকথা, নবী আলাইহিস সালাম তার উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সমগ্র কল্যাণ নিয়ে আগমন করেছেন। এর বাইরে কারো কাছেই তাদের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। তাহলে কীভাবে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, তার আনীত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা অসম্পূর্ণ—যার সম্পূরক হিসেবে বহিরাগত কোনো রাজনৈতিক চিন্তা অথবা যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োজন!! অথচ বিশ্বসভ্যতা এ যাবত এর থেকে উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনদর্শনের দরজায় করাঘাত করতে পারেনি?

এমন ধারণা যারা করে থাকে তাদের অবস্থা হলো ওইসব ব্যক্তির মতো, যারা মনে করে মানবজীবন পরিচালনার জন্য সর্বশেষ নবী মুহাম্মদের পরেও আরও নবীর দরকার! মাআজাল্লাহ!!

বস্তুত এসবের কারণ হলো, নবী আলাইহিস সালামের আনীত জীবনদর্শনের ব্যাপারে এসব ধারণাকারীর অস্পষ্ট উপলব্ধি ও স্বল্প বুঝশক্তি, যা আল্লাহ তায়ালা সাহাবিদের মাঝে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন। তারা নবীজির আনীত বিধানের প্রতি

সন্তুষ্ট থেকেছেন। এর বাইরের বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। নববি বিধান লালন করেই মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করেছেন। দেশ-দেশান্তরে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেছেন। তারা বলতেন, এই হলো (বিধানাবলি) আমাদের প্রতি নবীজির প্রতিশ্রুতি আর এটাই হলো (অর্থাৎ আমাদের বিজিত দিকগুলো) তোমাদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু এই ভয়ে রাসুলুল্লাহর হাদিস বর্ণনা করতে বারণ করতেন যে, মানুষ এ দিকে অধিক ঝুঁকে যাওয়ার কারণে কুরআন থেকে গাফেল হয়ে পড়বে। যদি তিনি সাম্প্রতিক মানুষদের অবস্থা দেখতেন, যারা নিজেদের মনগড়া রায়, চিন্তা-ফিকির ও বুদ্ধিবৃত্তির ধোঁয়া তুলে কুরআন-সুন্নাহ থেকে ক্রমশ সটকে পড়ছে তাহলে তাদের ব্যাপারে কী বলতেন (সাহায্য প্রার্থনা কেবল রবের কাছেই)!!

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে।[৭৫]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—'আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাজিল করেছি যা এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।'[৭৬]

মহান রবের বাণী—'হে মানবকুল, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।'[৭৭]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর বক্তব্যের সমাপ্তি এখানেই।[৭৮]

যা হোক, কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জন করতে হবে; অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের পূর্বে এর শরয়ি বিধান জেনে নেওয়া ওয়াজিব। যেমনভাবে পূর্বের এই নীতি তোমার সামনে স্পষ্ট, তদ্রূপ এটাও তোমার সম্মুখে দৃশ্যমান; অবশ্যপালনীয়

---

[৭৫] সুরা আনকাবুত, আয়াত ৫২

[৭৬] সুরা নাহল, আয়াত ৮৯

[৭৭] সুরা ইউনুস, আয়াত ৫৭

[৭৮] ইলামুল মুআক্কিন : ৪/৩৭৫-৩৭৭

শরয়ি সকল বিধান বান্দাকে কেয়ামত অবধি মানতে হবে। কারণ, আমাদের নবীর পরে আর কোনো নবী আসবে না এবং এই শরিয়ত ছাড়া কেয়ামত পর্যন্ত নতুন কোনো শরিয়ত প্রবর্তিত হবে না।

কথা ও কাজের আগে জ্ঞানার্জন যখন অবধারিত, তখন প্রশ্ন জাগে; ইলমে শরিয়তের যাবতীয় বিধান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব নাকি প্রত্যেকের অল্পকিছু বিধান জেনে নিলেই যথেষ্ট হবে?

সেই মানদণ্ড কী, কতটুকু পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব? অথবা কতটুকু জানা ফরজে আইন? নিম্নযুক্ত আলোচনা এবং তৎপরবর্তী আলাপই হলো এর বিষয়বস্তু।

ইলমে শরয়ির ফরজে আইন পরিচিতি

যে ইলম অর্জন করা মুকাল্লাফ[৭৯] তথা মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান সকলের উপর ফরজ। আর তা এমন ইলম, যা অর্জন করা ছাড়া বান্দার জন্য তার উপর আরোপিত ওয়াজিবগুলো আদায় করা অসম্ভব। এই সংজ্ঞাটি ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহর 'ফরজে আইন ইলম' বিষয়ক সংজ্ঞা থেকে আহরিত।

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন :

وهو قوله رحمه الله [فرض العين - أي من العلم الشرعي - وهو تعلّم المكلّف مالا يتأدي الواجب الذي تعيَّن عليه فعله إلا به]

শরিয়তের ফরজে আইন ইলম হলো, যা অর্জন ব্যতিরেকে মুকাল্লাফ ব্যক্তি তার উপর আরোপিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে অক্ষম।[৮০]

এটাই পছন্দনীয় সংজ্ঞা। তবে আলেমগণ এ ছাড়া আরও কিছু সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর ব্যাখ্যা একটি, যা তিনি ফরজে আইন ইলমের পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন :

وقال الشافعي رحمه الله لفرض العين من العلم بأنه [علم عامَّة لايسع بالغا غير مغلوب على عقله جهلُه... مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرَّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا، مما كُلِّف العباد أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ماحَرَّم عليهم منه.

এমন সাধারণ ইলম, যা বিবেক সহজেই গ্রহণ করতে পারে, অজ্ঞতা এতে বাধ সাধে না। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর অর্পিত রমজান মাসের রোজা, সামর্থ্য হলে বাইতুল্লাহর হজ সম্পন্ন করা, সম্পদের জাকাত দেওয়া। এ ছাড়া রয়েছে জিনার নিষিদ্ধতা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, চুরি করা ও মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকা এবং এজাতীয়

---

[৭৯] এটি একটি শরয়ি পরিভাষা। প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে মুকাল্লাফ বলা হয়, শর্ত-শারায়েতের উপস্থিতির ভিত্তিতে যার উপর শরিয়তের দায়িত্ব-কর্তব্য বর্তায়।

[৮০] নববী রচিত আল-মাজমুয়া : ১/২৪

আর যেসব ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড রয়েছে, তাতে নিষিদ্ধতার বিধান কার্যকর হবে। অর্থাৎ যেসমস্ত ব্যাপারে বান্দা আদেশপ্রাপ্ত, তন্মধ্যে কিছু তারা বুঝবে, জানবে, সশরীরে পালন করবে এবং সম্পদ থেকে আদায় করবে আর কিছু আছে নিষেধমূলক বিধান, যা থেকে তারা বিরত থাকবে।[৮১]

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ ফরজে আইন ইলমকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন :

أن على كل أحد فرضا أن يتعلم مالا يسعه جهله من علم حاله. وقال أيضا إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সমসাময়িক এমন ইলম অর্জন করা ফরজ, যার থেকে অজ্ঞ থাকার সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন—ইলম অন্বেষণ ফরজ- এর ব্যাখ্যা হলো, ব্যক্তির দীনি কোনো বিষয়ে এমনভাবে নিমগ্ন হওয়া, যাতে জিজ্ঞেস করে সে বিষয়ে জেনে নিতে পারে।

তার আরেক ব্যাখ্যায় রয়েছে :

وقال أيضا - وقد سُئِل ماالذي يجب على الناس من تعلم العلم - فقال أن لايُقدم الرجل على الشيء إلا بعلم، يسأل ويتعلم، فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কী ধরনের ইলম শিক্ষা করা মানুষের উপর ওয়াজিব। তিনি বললেন, না-জেনে কোনো কাজের পদক্ষেপ নেবে না, বরং (প্রথমে) জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। এই ধরনের ইলমই মানুষের জন্য শিক্ষা করা আবশ্যক।

আর উপর্যুক্ত সমস্ত আলোচনা খতিব বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ তার *আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ* কিতাবে উল্লেখ করেছেন।[৮২]

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ ফরজে আইন ইলমের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেন :

وَوَصَفَ مالك رحمه الله فرض العين من العلم بقوله [انظر مايلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، ومن حين تمسي إلى حين تصبح فالزمه، ولاتؤثر عليه شيئا

---

[৮১] আর-রিসালাহ : ৩৫৭

[৮২] আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ : ১/৪৫

লক্ষ কর, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কী প্রয়োজন পড়ছে এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কীসের দরকার হচ্ছে? সেটাই গ্রহণ করে নাও। অন্যকিছু এর উপর প্রাধান্য দিয়ো না।[৮৩]

আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ ফরজে আইন ইলমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ণনা করেন :

وقد سُئِل عن الرجل عليه طلب العلم - فقال: أما مايقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، قال ينبغي له أن يعلم ذلك

তাকে এক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ইলমের পরিমাণ কী হবে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, যেই পরিমাণ ইলম দ্বারা সে সালাত আদায় করে, দীনের অন্যান্য বিষয় তথা রোজা ও জাকাতের বিধান পালন করে। এবং তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিধিনিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, ওই ব্যক্তির জন্য উচিত এই বিষয়গুলোও জেনে নেওয়া।[৮৪]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন :

فرض العين من العلم بقوله طلبُ كل واحدٍ عِلم ماأمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان

ফরজে আইন ইলম হলো, আল্লাহ কীসের আদেশ করেছেন এবং কীসে বিরত থাকতে বলেছেন- এ বিষয়ে প্রত্যেকের অবগতি লাভ করা।[৮৫]

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ ফরজে আইন ইলমকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তা যে অন্যদের সংজ্ঞা থেকে বেশি অর্থবহ; তা কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তাই আমরা তার সংজ্ঞাটিই নির্বাচন করেছি।

এই ওয়াজিব ইলমের পরিমাণ নির্ণয়ে ব্যক্তিভেদে পার্থক্য রয়েছে। যদিও যৌথ কিছু বিষয় রয়েছে, যা শিক্ষা করা সকল বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। আমরা পঞ্চম আলোচনায় ফরজে আইন ইলমের প্রকারভেদের অবতারণা করব, ইনশাআল্লাহ।

---

[৮৩] আল-ফাকিহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ : ১/৪৬

[৮৪] প্রাগুক্ত : ১/৪৬

[৮৫] মাজমাউল ফাতওয়া : ২৮/৮০

ইলম ফরজ হওয়ার দলিল

ফরজে আইন পরিমাণ ইলম তলব করা ওয়াজিব হওয়ার অনেক দলিল কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা (উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত)-য় বিদ্যমান আছে, যা 'দ্বিতীয় আলোচনা'য় (কথা ও কাজের আগে ইলম অর্জন করা ওয়াজিব) গত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের সামনে অগ্রণী হয়ো না।[৮৬]

আল্লাহ তায়ালা অন্যৎর বলেন :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও যদি তোমরা না জেনে থাক।[৮৭]

এ ছাড়া আরও দলিল রয়েছে, যার মাধ্যমে কথা ও কাজের প্রতি মনোনিবেশ করার পূর্বে ইলম শিক্ষা করা যে ওয়াজিব, সে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

আমরা এখানে যেসমস্ত দলিল উল্লেখ করলাম, এগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু দলিল উল্লেখ করব, যেগুলো ফরজে আইন পরিমাণ ইলম তলবের অনস্বীকার্যতা এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার অপরিহার্যতার বিষয়টি সুস্পষ্ট করবে। যেমন :

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

طلب العلم فريضة على كل مسلم

ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।

হাদিসটি ইবনে মাজাহসহ অন্যান্য মুহাদ্দিস আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যার সবকটিই দুর্বল। তবে ইমাম সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহ সনদের আধিক্যের কারণে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

---

[৮৬] সুরা হুজুরাত, আয়াত ১

[৮৭] সুরা নাহল, আয়াত ৪৩

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালেক ইবনে হুয়াইরিসকে বলেন :

ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم

তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের ইলম শিক্ষা দাও।

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ তার *সহিহ* কিতাবের ইলম অধ্যায়ে মালেক ইবনে হুয়াইরিস থেকে মুআল্লাকসূত্রে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তবে আজান, জিহাদ, আদাব ও আখবারুল আহাদ অধ্যায়ের একাধিক স্থানে হাদিসটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন, আজান অধ্যায়ে ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি মালেক ইবনে হুয়াইরিস থেকে নকল করেন; মালেক বলেন : 'আমরা নবীজির কাছে এলাম। আমরা সবাই ছিলাম যুবক। প্রায় বিশ রাত্রি তার নিকট অবস্থান করলাম। নবী আলাইহিস সালাম ছিলেন দয়ার আধার। তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও, তবে দেশবাসীকে ইলম শিক্ষা দেবে, তাদের সালাতের আদেশ করবে; সময় বলে দেবে যে, এই সালাত এই সময়ে পড়বে। যখন সালাতের সময় হয়ে যাবে, তোমাদের একজন আজান দেবে, তোমাদের মধ্য থেকে যে সবচেয়ে বড়, সে সালাতের ইমামতি করবে।'[৮৮]

আরেক রেওয়ায়েতে আছে, নবী আলাইহিস সালাম বলেন—'তোমরা স্বজনদের কাছে ফিরে যাও। তাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা কর, ইলম শিক্ষা দাও এবং শিখতে আদেশ কর।'[৮৯]

আবদে কায়েসের প্রতিনিধিদল নবী আলাইহিস সালামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, নবীজি তাদের বলেন :

احفظوه وأخبروا من ورائكم

তোমরা হৃদয়ে ঈমান ধারণ কর এবং যারা অনুপস্থিত, তাদের কাছে পৌঁছে দাও।[৯০]

মূলত নবী আলাইহিস সালাম আদেশ করেছেন, তিনি তাদের ঈমানের ব্যাখ্যায় যে ইলম শিক্ষা দিলেন, তা যেন তারা সংরক্ষণ করে এবং নিজ গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়।

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ *সহিহ* কিতাবের ইলম অধ্যায়ে একটি শিরোনাম[৯১] উল্লেখ করেন :

---

[৮৮] বুখারি, হাদসি নং ৬৮৫

[৮৯] বুখারি, হাদসি নং ৬৩১

[৯০] বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

باب تحريض النبى ﷺ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان و العلم و يخبروا من وراءهم. و قال مالك بن الحويرث : قال لنا النبي ﷺ ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم

অধ্যায়ঃ নবী আলাইহিস সালাম আবদে কায়েসের প্রতিনিধিদলকে ঈমান ও ইলম হেফাজত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং গোত্রের লোকদের কাছে সংবাদটি পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করেছেন। মালেক ইবনে হুয়াইরিস বলেন—নবী আলাইহিস সালাম আমাদের বলেন, তোমরা পরিজনের কাছে ফিরে যাও, অতঃপর তাদের ইলম শিক্ষা দাও।

এরপর ইমাম বুখারি নিজ সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন; ইবনে আব্বাস বলেন, আবদে কায়েসের প্রতিনিধিদল নবী আলাইহিস সালামের কাছে এল। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, (তোমরা) কার প্রতিনিধি কিংবা বলেছেন তোমরা কোন গোত্রের প্রতিনিধি? প্রত্যুত্তরে তারা বলল, রবিয়া গোত্রের। নবীজি বললেন, কওমের কল্যাণ হোক, লাঞ্ছনা, অপদস্থতা নিপাত যাক। গোত্রের লোকজন বলতে শুরু করল, আমরা আপনার দরবারে অনেক বিপদসংকুল পথ মাড়িয়ে এসেছি। আপনার নিকট আসতে আমাদের মাঝখানে কাফেরগোষ্ঠী মুযার গোত্রের বসতি পড়ে। তাই রমজান মাস ছাড়া আপনার কাছে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমাদের এমন কিছু আমলের কথা বলুন, যা আমরা গোত্রীয় ভাইদের কাছে পৌঁছাতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমল করে জান্নাত লাভ করতে পারি। নবী আলাইহিস সালাম তাদের চারটি ব্যাপারে আদেশ করলেন এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বললেন। তিনি তাদেরকে (প্রথমে) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দিলেন। রাসুল বলেন—তোমরা কি জান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কী? তারা বলল, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল বললেন, (ঈমান হলো) একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া। আর নিষেধ করেছেন (চারটি বিষয়); দুব্বা, হানতাম ও মুজাফ্‌ফাত।[৯২] শোবা বলেন—(চতুর্থ ক্ষেত্রে) কখনো তিনি বলেন : 'নাকির' আবার কখনো বলেন 'নুকায়্যার'। এরপর নবী আলাইহিস সালাম বলেন—'তোমরা কথাগুলো মনে রাখবে এবং অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেবে।[৯৩]

---

[৯১] শিরোনাম (অধ্যায়) নং : ২৫

[৯২] এগুলোর পরিচয় সামনে আসবে।

[৯৩] বুখারি শরিফ : ৮৭

নিষিদ্ধ জিনিসগুলো এক ধরনের পাত্র, যাতে আরবরা 'নাবিজ' তৈরি করত। কারণ, দ্রুত মদ তৈরি হতে এই পাত্রগুলো সহায়ক ছিল। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রগুলোরই ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, যাতে মূল থেকেই হারামের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এরপর পাত্রগুলো ব্যবহারের বৈধতা দেওয়া হয়, তবে নেশাসৃষ্টিকারী পানীয় নিষিদ্ধই থেকে যায়।[১৪]

নাবিজ (মাদক) তৈরি করা এবং শরিয়তে এর অনুমোদনের বিষয়টি হলো, আরবরা কূপ থেকে পানি পান করত। পানি লবণাক্ত থাকায় তারা খেজুর বা কিসমিস ফেলে রাখত, যাতে পানিতে মিষ্টতা আসে এবং সুপেয় হয়। এরপর পানি পাত্রে ভরে রাখত (ওয়াফদে আবদুল কায়েসের হাদিস থেকে এরকমটি বুঝা যায়)। কখনো তারা দীর্ঘ সময় ধরে পানি এভাবে রেখে দিত, কিসমিস ও খেজুরের কারণে পানিতে ঝাঁঝ উঠে একসময় তা মদে রূপান্তরিত হয়ে যেত। অতঃপর প্রয়োজন-বিবেচনায় তাদের নাবিজ পানের অনুমোদন দেওয়া হয়, তবে নেশাসৃষ্টির অবস্থায় চলে গেলে তার থেকে বারণ করা হয়।

সুতরাং হাদিসে আনাস, মালেক ইবনে হুয়াইরিস ও আবদে কায়েস; এই হাদিস-তিনটিতে রয়েছে ইলম অন্বেষণ করা এবং মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

তবে এই দলিলগুলো শর্তযুক্ত হবে। কারণ হলো, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর طلب العلم فريضة على كل مسلم হাদিসে العلم শব্দটি আলিফ-লামযুক্ত ইসমে জিনস, যা ব্যাপক অর্থ ধারণ করে থাকে (অর্থ দাঁড়ায়; সমস্ত ইলম সকল মানুষের জন্য ওয়াজিব)। আর যদি العلم শব্দের আলিফ-লামকে 'আহদি' (নির্দিষ্টজ্ঞাপক) অর্থে ধরা হয়, তখন লক্ষ্য হয় 'ইলমে শরয়ি' (অর্থ আগেরটাই দাঁড়ায়)। এতে শব্দের ব্যাপকতা বাতিল হয় না। অর্থাৎ শব্দটি সমস্ত ইলমে শরিয়তকে পরিবেষ্টন করছে এবং অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ইলমে শরিয়তের সমগ্র ইলম সকল মুসলমানের জন্য ফরজ।

অথচ বিষয়টি কিন্তু এরকম নয়। শব্দের এই ব্যাপকতা; 'কথা ও কাজের পূর্বে ইলম অর্জন করা ওয়াজিব' এই নীতির সাথে শর্তযুক্ত হবে (সব ইলম নয়, যখন যে কথা ও কাজের দরকার হবে, তৎসংশ্লিষ্ট ইলম অর্জনই উদ্দেশ্য)।

যেমন আল্লাহর বাণী :

اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ

আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুরা হুদ, আয়াত ৪৭

---

[১৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন ফাতহুল বারি, কিতাবুল আশরিবা : ১/১৩৫

এরকমভাবে কারাফি রহিমাহুল্লাহ বলেন, নবী আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি আমার নির্দেশিত আমল ভিন্ন অন্য আমল করবে, তার সেই আমল প্রত্যাখ্যাত হবে।'[৯৫]

উপর্যুক্ত দলিল-দস্তাবেজ ও কারাফির উল্লেখকৃত ইজমা থেকে সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি দৃশ্যমান হয়; প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলম শেখার ওয়াজিব পরিমাণ হলো, যা অর্জন করা ব্যতীত তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় طلب العلم فريضة على كل مسلم হাদিসের العلم শব্দটি শর্তযুক্ত, ব্যাপক অর্থবোধক নয়।

যেমন শব্দটি শর্তযুক্ত হচ্ছে আল্লাহর বাণী দ্বারা :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়; তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা সতর্ক হতে পারে।

হাদিসটি নির্দেশ করে সমগ্র মুসলমানের ইলম অর্জন করতে হবে আর আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় উক্ত নির্দেশনাটি কিছু মুসলমানের জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি অর্জন করার জন্য; সকলের জন্য নয়। সুতরাং হাদিসের প্রয়োগক্ষেত্র হলো ফরজে আইন পরিমাণ ইলমের উপর, যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র হলো ফরজে কেফায়া পরিমাণ ইলমের উপর। যেমনটি উদ্ধৃত হয়েছে ইলমের প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলেমদের আলোচনায়, যা পূর্বের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯৬]

---

[৯৫] সহিহ মুসলিম

[৯৬] ইবনে আবদুল বার রহ. যেমনটি হাসান ইবনে রবিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাসান ইবনে রবিয়া বলেন, আমি ইবনে মুবারকের নিকট নবীজির হাদিস 'طلب العلم فريضة على كل مسلم' এর ব্যাপারে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, লোকজন যেমন মনে করে, সেরকম নয়। বরং যে ব্যক্তি দীনি কোনো বিষয়ে সংশয়ে নিপতিত হয়, কেবল সে বিষয়ে ইলম অর্জন করা উক্ত ব্যক্তির জন্য ফরজ।
আরেক সনদে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বরাতে ইবনে আবদুল বার রহ. উল্লেখ করেন, সুফিয়ান বলেন, ইলম তলব করা আর জিহাদে গমন করা সকলের উপর ফরজ নয়; বরং কিছু সংখ্যক মানুষ দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন :
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

ফরজে আইন ইলমের প্রকারভেদ

কথা ও কাজের প্রয়োজন বিবেচনায় ওয়াজিব পরিমাণ ইলমকে মৌলিকভাবে দু'-ভাগ করা যায় :

প্রথমত এমন ইলম, যা একজন মুসলমানের জন্য সূচনা থেকেই শিক্ষা করা ওয়াজিব, যাতে সে বারবার সংঘটিত হওয়া দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয় এবং অতীব প্রয়োজনীয় লেনদেন আনজাম দিতে পারে। এই প্রকার ইলম আবার দুই প্রকার।

ক. এমন প্রয়োজনীয় ইলম, যা সব জায়গায় সর্বযুগে সকল মানুষের শিক্ষা করা ওয়াজিব। আমরা যার (পারিভাষিক) নাম দেব العلم الواجب العيني العام

খ. এমন ইলম, যা কিছু মানুষের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে, সবার জন্য নয়। দায়িত্ব ও কর্তব্যের স্তর-ভেদে পরস্পরের মাঝে যার পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এর (পারিভাষিক) নাম হবে العلم الواجب العيني الخاص

দ্বিতীয়ত এমন ইলম, যা অর্জন করা তখনি ওয়াজিব হবে যখন কাজটি করা হবে অথবা করার সম্ভাবনা দেখা দেবে (অর্থাৎ, প্রতিযুগে উদ্ভাবিত নতুন নতুন সংকটের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান)। তবে এরকম বিষয়ের বাস্তবতা দুর্লভ; স্বাভাবিকভাবে তেমন একটা ঘটে না। এই বিষয়গুলো আরবিভাষায় النوازل শব্দে ব্যক্ত করা হয়। এই প্রকার বিষয়ের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি-ভেদে ইলমের পরিমাণে ভিন্নতা এসে থাকে।

সারকথা হলো, ফরজে আইন ইলম তিন প্রকার :

এক. العلم الواجب العيني العام (যা সবার জন্য ওয়াজিব)

দুই. العلم الواجب العيني الخاص (যা কিছু মানুষের জন্য ওয়াজিব)

তিন. العلم بأحكام النوازل (যা মাঝেমধ্যে ব্যক্তিবিশেষের উপর ওয়াজিব)

অচিরেই আমরা প্রত্যেক প্রকারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে ব্যাপারটি সহজেই অনুমান করা যায় যে, সবধরনের ইলম সকলের জন্য শিক্ষা করা ফরজ নয়। কিছু ইলম এমন রয়েছে, যা কতিপয় ব্যক্তি শিক্ষা করলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়. আলোচ্য আয়াত থেকে যা ইতিমধ্যে পষ্ট হয়েছে। (অনুবাদক)

প্রথম : العلم الواجب العيني العام (যা সবার জন্য ওয়াজিব)
এই প্রকারের ইলম প্রতিটি যুগের প্রতিটি জায়গার সকল মানুষের জন্য শিক্ষা করা আবশ্যক। এই ইলমের অপরিহার্যতার বয়ানে সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান সমানভাবে শরিক। এখানে পর্যায়ক্রমে এইসব ইলমের আলোচনা উল্লেখ করা হচ্ছে :

এক.
ইসলামের পাঁচ রোকন সম্পর্কে সম্যক অবগতি থাকা; একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ করা।

প্রথম রোকনটির (শাহাদাতাইন) ক্ষেত্রে শুধু মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট নয়; বরং মর্ম বুঝে নেওয়া জরুরি, لا إله إلا الله (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর সাক্ষ্য সহি-শুদ্ধ হবার শর্তসমূহ জেনে নেওয়া আবশ্যক, যাতে বান্দা 'শাহাদাতাইন'বহির্ভূত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে।

ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ বলেন—'উদাহরণস্বরূপ দিনের প্রান্তভাগে যখন স্বপ্নদোষ অথবা বয়ঃজনিত কারণে কোনো ব্যক্তির মাঝে বালেগ হওয়ার আলামত প্রকাশ পায়, তখন তার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে শাহাদাতের কালেমা-দুটি শিক্ষা করা এবং তার মর্মার্থ অনুধাবন করা। কালেমা-দুটি হলো لا إله إلا الله محمد رسول الله [আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল]।[৯৭]

মর্মার্থ জানার ব্যাখ্যা হলো, لا إله (লা-ইলাহা) অর্থ- কোনো ইলাহ নেই, এবং إلا الله (ইল্লাল্লাহ) মানে, আল্লাহর অস্তিত্বই বিদ্যমান- একথার সাক্ষ্য দেওয়া। অর্থাৎ ইবাদত ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বর্জন করে গাইরুল্লাহর প্রভুত্ব প্রত্যাখ্যান করা এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে একত্ববাদকে তার জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন, সালাত, দোয়া, মানত, কুরবানি, ভয়, আশা ও বিচারকার্য (সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া)। যে ব্যক্তি এর কোনো একটিতে পরিবর্তন ঘটাল, কিংবা আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন কোনো ইলাহ-এর দিকে সম্পৃক্ত করল; বুঝতে হবে তার কর্ম তার ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। তার সাক্ষ্য যথেষ্ট হয়নি। (ঈমানের) সাক্ষ্যবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ায় সে কাফেরগোষ্ঠীর তালিকাভুক্ত হবে। সুতরাং এই সাক্ষ্য পরিশোধন করতে সাক্ষ্যের

---

[৯৭] ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন : ১/২৫

অন্তর্নিহিত বিষয় 'ইসবাত-নফি' তথা আল্লাহর একত্ব স্বীকার করা এবং গাইরুল্লাহকে বর্জন করা— এর বাস্তবায়ন আবশ্যক।

ইবাদতের বাস্তবতা হলো, নিজেকে সংকুচিত করে দ্বিধাহীনচিত্তে আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়া। এটা বাস্তবায়নের স্বীকৃতি তখনি পায়, যখন বান্দার গতিবিধি, চলাফেরা, চিন্তা-ফিকির ও পদক্ষেপ-পদচারণা রবের উদ্দেশ্যের অনুগামী হয়। সর্বক্ষেত্রে বান্দা প্রভুর আদেশ আঁকড়ে ধরে এবং নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বেঁচে থাকে। যেমন, আল্লাহ্ তায়ালা নবীজিকে লক্ষ করে বলেন—'বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তার কোনো অংশীদার নেই। তাই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যকারী।'[৯৮] এটাকেই বলে নির্ভেজাল দাসত্ব।

একারণে কিছু আলেম ইবাদতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে; 'আল্লাহ তায়ালা রাসুলগণের জবানে যেসকল বিধান প্রবর্তন করেছেন তা মেনে নেওয়ার নামই ইবাদত।' এরপর মহান রব তার আদেশ ও নিষেধের বিরুদ্ধাচরণকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। সবচেয়ে মারাত্মক বিরুদ্ধাচরণ হলো, ইবাদতের বাস্তবতা একেবারে প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য অস্বীকার করা। আর এগুলো এমন বিষয়, যা উপেক্ষা করার কারণে এমন আকিদা-বিশ্বাস, বক্তব্য ও কার্যাবলি অস্বীকার করা হয়, যা বান্দাকে কুফুরি পর্যন্ত নিয়ে যায়। আর এ ব্যাপারে শরিয়তের নস স্পষ্ট। এর পরের স্তর কবিরা গুনাহ। অবশ্য তা কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছায় না; কিন্তু উক্ত কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে ফাসেক বলা হয়। সর্বশেষ স্তর হলো সগিরা গুনাহ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল- এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো, নবী যে সংবাদ নিয়ে এসেছেন, তার সত্যায়ন করা এবং যেই কাজ করার আদেশ করেছেন, তার প্রতি আনুগত্য পোষণ করা। অর্থাৎ একমাত্র নবী মুহাম্মদের আদর্শ অনুসরণ করা, যাতে নবী আলাইহিস সালামের তরিকা থেকে বান্দারা বুঝে নিতে পারে, কীভাবে রবের ইবাদত করতে হয়। প্রথম সাক্ষ্য তথা আল্লাহর একত্ববাদের দাবি অনুসারে বান্দার উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ের পদ্ধতি কী তা জানা, যাতে করে বান্দাগণ নবী আলাইহিস সালামের আনীত বিধান মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। নিজ কিংবা অন্যের মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি এবং আপন বা পরের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকে, যদিও সেটা দৃশ্যত ভালো মনে হোক না কেন। তাই তো মহান রব বলেন—'আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তাহলে আমার

---

[৯৮] সুরা আনআম, আয়াত ১৬২, ১৬৩

অনুসরণ কর। এতে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের ত্রুটি মার্জনা করবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'[৯৯]

আর 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই' একথার সাক্ষ্য পরিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো, এমন ইলম থাকা, যা জাহালতের পরিপন্থি। অর্থাৎ لا إله إلا الله এর মর্মার্থ জানা। এমন অবিচল বিশ্বাস থাকা, যা সংশয়ের বিপরীত। খাঁটি নিয়তে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, যাতে শিরকের কোনো আভাস নেই। এমনভাবে সত্যায়ন করা, যাতে মিথ্যার কোনো আভাস নেই। বিদ্বেষমুক্ত নিরেট ভালোবাসা নিয়ে সাক্ষ্য দেওয়া। একত্ববাদকে এমনভাবে মেনে নেওয়া, যাতে কিছুমাত্র বর্জনেরও অবকাশ নেই। উলুহিয়্যাতকে এমনভাবে গ্রহণ করা, যেখানে কোনো প্রত্যাখ্যান নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য গ্রহণ করার মতো কুফুরি নেই। যে ব্যক্তি এই দুই সাক্ষ্য মুখে উচ্চারণ করে এবং তার থেকে ঈমান ভঙ্গকারী কোনো কাজ প্রকাশ না পায়, সে মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হবে। ইয়াকিন, ইখলাস, সততা ও ভালোবাসা হলো রুহানি আমল এবং কলবি ইবাদত, পার্থিব দুনিয়ায় যা জানার কোনো উপায়-অবলম্বন নেই; যদিও মাঝেমধ্যে তার কিছু আলামত প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টা আল্লাহর জিম্মায় ন্যস্ত, কেয়ামত দিবসে তিনি বান্দাদের এ-বিষয়ের হিসেব নেবেন। যেমন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—'যখন তারা আল্লাহর ইবাদতের মৌখিক স্বীকারোক্তি দেয়, তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার উপর হারাম হয়ে যায়, তবে ইসলামের কোনো বিধান লংঘন করলে ভিন্ন কথা (তখন বিধান মোতাবেক ক্ষেত্রবিশেষ তার রক্ত ও সম্পদ হালাল হয়ে থাকে)। এবং তাদের বিষয়টি মহান রবের উপর ন্যস্ত থাকে।'[১০০]

দৃশ্যত ইসলামের হুকুম প্রযোজ্য হবার জন্য তাওহিদের দুইসাক্ষ্যের মর্মার্থ অনুধাবন করা শর্ত নয়। বাস্তব কথা হলো, ইসলামগ্রহণ পরিশুদ্ধ হবার জন্য এটা শর্ত। এখানে আলোচনার দুটি প্রেক্ষাপট রয়েছে :

(এক) ইসলামের বাহ্যত হুকুম প্রযোজ্য হবার জন্য তাওহিদের দুই সাক্ষ্যের মর্মার্থ অনুধাবন করা শর্ত নয়; অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হতে চায়, তার উপর ইসলামের হুকুম প্রয়োগ হতে তাওহিদের মর্মকথা অনুসন্ধান করা আবশ্যক না। এরকমভাবে যার বাহ্যিক বেশভূষা ইসলামবান্ধব হবে, তার জন্য ইসলামের হুকুম-আহকাম প্রযোজ্য- একথা প্রমাণ করার জন্য এটা জরুরি না যে, কালেমায়ে তাওহিদের মর্মবাণী জানতে হবে। তাওহিদের মর্মকথা অবহিত কি না

---

[৯৯] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১
[১০০] হাদিসটি বুখারি ও মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করেছেন।

এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়। এর সুস্পষ্ট দলিল রাসুলের হাদিস; যে ইসলামের স্বীকারোক্তি দিয়েছে, নবী আলাইহিস সালাম তার ইসলামই কবুল করে নিয়েছেন কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই। তার উপর ইসলামের বিধান আরোপ করেছেন।

এরপর তারা পর্যায়ক্রমে নিজেদের অবশ্যপালনীয় বিধানাবলি জেনে নিতেন। যেমনটি উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকে বুঝা যায়। নবী আলাইহিস সালাম উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বলেন—'সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে!'[১০১] মুখে 'শাহাদাত' উচ্চারণ করাকে নবী আলাইহিস সালাম উচ্চারণকারীর রক্ষাকবচ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইসলামের হুকুম প্রযোজ্য হওয়ার জন্য এই 'উচ্চারণই' যথেষ্ট।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কতক ব্যক্তির মুসলমানিত্ব নিরীক্ষণ করার ব্যাপারে যা বর্ণিত আছে, তা বিক্ষিপ্ত কিছু অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; মূলনীতি হিসেবে নয়। তদুপরি নবীজির জীবদ্দশায় অসংখ্য মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে; তবে এর জন্য তাদের পরীক্ষোত্তীর্ণ হতে হয়নি। কাউকে যাচাই-বাছাই করা বৈধ কিংবা আবশ্যক হয় বিশেষ কিছু কারণে। দাসি সম্পর্কিত হাদিসের ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম বর্ণনা করেন, 'তুমি তাকে আজাদ করে দাও, কারণ সে মুমিন।'[১০২] (তার ঈমান সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল)। পরীক্ষা করার কারণ হলো, দাস-দাসি আজাদ হবার জন্য বাস্তবমুখী ঈমান শর্ত। কেননা, আল্লাহ তায়ালা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুমিন দাস-দাসির আজাদ করার শর্ত আরোপ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'মুমিন দাসি আজাদ করা'। এখানে দাসির ঈমান থাকার বিষয়টি স্পষ্ট। আজাদ করার অনুরূপ সাক্ষ্যদানের বিষয়টিও; বিচারক সাক্ষ্যদাতা মুসলিম কি না, তার সততা ঠিক আছে কি না—ভালোভাবে পরখ করে নেবেন, যাতে সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্যের বৈধতা দিতে পারেন এবং গ্রহণ করতে সক্ষম হন। এটা বিচারকের জিম্মাদারি।

এই বক্তব্য আল্লাহর কালামে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন—'হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারী হিজরত করে আসে, তখন তাদের পরীক্ষা কর।'[১০৩]

আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—এ-জাতীয় ও অনুরূপ স্থানগুলোতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়া আবশ্যক। আর এটাই হচ্ছে 'শরয়ি বিশ্লেষণ'।

---

[১০১] বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
[১০২] সহিহ মুসলিম
[১০৩] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ১০

সুতরাং যে ইসলামে প্রবেশ করতে চায় অথবা যার বেশভূষায় ইসলাম (অর্থাৎ সে মুসলিম কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা অজানা)। তার উপর পার্থিব হুকুম প্রযোজ্য হবার জন্য তাওহিদের কালেমার মর্মকথা জানা আছে কি না, তা যাচাই করা অপরিহার্য নয়। যে এরকম বক্তব্য প্রদান করবে, সে (দীনের মধ্যে) নতুন বিষয়ের উদ্ভাবনকারী সাব্যস্ত হবে।

ঈমানের পরিশুদ্ধতার জন্য তাওহিদের মর্মবাণী জানতে হবে, তাহলেই মুসলমানের উপর ইসলামের হুকুম প্রযোজ্য হবে- এ ধরনের শর্ত আরোপ করা, এটা যেন ওইসব মুতাকাল্লিমের অবস্থার মতো—যুক্তিনির্ভর দলিল-দস্তাবেজ জানা থাকা যাদের মুতাকাল্লিম বলা সহিহ হবার শর্ত। এটা বাতিল শর্ত।

ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ ইমাম গাজালির সূত্রে উল্লেখ করেন—'আমি এমন অনেক দল-গোষ্ঠী দেখেছি, যারা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত; তারা সাধারণ মুসলমানদের তাকফির করে থাকে। তারা মনে করে, যারা দলিলসহ শরিয়তের আকিদা-বিশ্বাস জানে না, তারা কাফের। এসব লোক প্রভুর অবারিত রহমতের ধারা সংকীর্ণ করে থাকে। জান্নাতকে তারা মুতাকাল্লিমদের একটি উপদলের সাথে বিশেষায়িত করতে চায়।

আবু জাফর ইবনে সামআনিও অনুরূপ আলোচনা করেছেন এবং উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রদানকারীদের দলিল খণ্ডনে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি বহু ইমামের বরাতে উল্লেখ করেন, তারা বলেন—'সাধারণ মানুষদের উপর এরকম চাপিয়ে দেওয়া যে 'দলিলসহ মৌলিক আকিদা জানতে হবে'- এটা জায়েজ নেই। কারণ, এটা অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়, যা ফিকহি মাসায়েল শিক্ষা করার থেকেও বেশি দুষ্কর। ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন, 'অনেকে বলেন 'প্রত্যেকের কাছে দাবি এটাই যে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহাতীত দৃঢ় সত্যায়ন, নবী-রাসুল ও তাদের আনীত বিধানাবলি যেভাবে যে পদ্ধতিতেই অর্জন হোক না কেন—বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি বিধান মানার পদ্ধতিটা নিরেট তাকলিদের তরিকায় হয় (এতে কোনো অসুবিধা নেই); যদি এর মাধ্যমে পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকা যায়।'

কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম-মুজতাহিদ ও আকাবির-আসলাফ অনুরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। তাদের অনেকে প্রকৃতিগত সহজাত মূলনীতির আলোকে দলিল পেশ করেছেন, নবী ও সাহাবি থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহ হুজ্জত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। নবী ও সাহাবিগণ আরবের মূর্খ-নির্বোধ লোকদের—যারা মূর্তিপূজা করত—ইসলামগ্রহণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাওহিদ তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহর স্বীকারোক্তি মেনে

নিয়েছেন। তাদের উপর দলিল-দস্তাবেজের বোঝা না চাপিয়ে ইসলামের বিধান আরোপ করেছেন।[১০৪]

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহও ইমাম কুরতুবির বক্তব্যের কাছাকাছি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১০৫]

(দুই) ইসলামগ্রহণ পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য 'শাহাদাতাইন'-এর মর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকা একটি শর্ত। পরিশুদ্ধ ইসলাম বলতে বুঝানো হয়—যা পরকালে আল্লাহর সম্মুখে বান্দাকে উপকৃত করবে। এ কারণেই ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ ইতিপূর্বে তার আলোচনায় উল্লেখ করেছেন- বান্দার উপর তখনি তাওহিদের মর্মবাণী উপলব্ধি করা ওয়াজিব হবে, যখন সে এর ব্যাখ্যা উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করবে। আর এটা জরুরি হয় কয়েক কারণে-

- কোনো ওয়াজিব আদায় করতে যেয়ে যে বিষয়ের প্রয়োজন পড়ে, সেটাও শিক্ষা করা ওয়াজিব। সুতরাং বান্দার উপর একত্ববাদ স্বীকার করা, শিরক থেকে পরহেজ করা এবং শুধু নবী আলাইহিস সালামের অনুসরণ করার জন্য শাহাদাতাইন-এর মর্ম শিক্ষা করা ওয়াজিব। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টা শিক্ষা করাই বান্দার উপর আবশ্যক; কেবল মুখে মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট নয়। এই অপরিহার্যতার গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।'[১০৬]
  এই আয়াতে কালেমায়ে শাহাদাত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা রয়েছে। ব্যাখ্যাসহ তা জানতে হবে, তাহলে বান্দা তার উপর অর্পিত কালেমার হাকিকত অনুধাবনকারী হিসেবে বিবেচ্য হবে। রাসুলুল্লাহ বলেন—'বান্দার উপর প্রভুর হক হলো, তারা রবের ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরিক করবে না।'[১০৭] এই হাদিসেও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাফসিল রয়েছে।
- যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ের ইলম ছাড়া সাক্ষ্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই; না আভিধানিক অর্থে, না পারিভাষিক অর্থে। আল্লাহর কালাম থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। আল্লাহ বলেন—'তবে যারা জেনে-বুঝে সত্য সাক্ষ্য দিত।'[১০৮]

---

[১০৪] ফাতহুল বারি : ১৩/ ৩৪৯-৩৫৩

[১০৫] শরহে নববি : ১/২১০, ২১১

[১০৬] সুরা নাহল, আয়াত ৩৬

[১০৭] বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[১০৮] সুরা যুখরুফ, আয়াত ৮৬

তাই ইলম শিক্ষা করা ওয়াজিব, যাতে সাক্ষ্য প্রদান বিশুদ্ধ হয়। সাক্ষ্যের অর্থধারণকারী এই ইলম ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আরও দলিল রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী—'এটা মানুষের একটা সংবাদনামা এবং যাতে তারা এর দ্বারা ভীত হয় এবং জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই-একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানেরা চিন্তাভাবনা করে।'[১০৯]

এ ছাড়া নবী আলাইহিস সালাম বলেন—'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জেনে মৃত্যুবরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১১০]

ইলম শব্দটি শাহাদাতের মর্ম বোঝার অর্থে জান্নাতে প্রবেশ করার শর্ত হিসেবে বিবেচিত এবং শাহাদাতের বাক্য-দুটির মর্ম বোঝা বাস্তবে পরকালে কল্যাণপ্রাপ্তির সাথে জড়িত। কেননা, শাহাদাতের বাক্য-দুটির মর্মার্থ জানা আমলের চাবিস্বরূপ, যেই আমল (বান্দার উপর) অবধারিত হয়ে থাকে শাহাদাতের কারণেই।

- যে আরবদের মাঝে নবীজি প্রেরিত হয়েছেন তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ, আলংকারিক ও বাগ্মী। তাদের বক্তব্য থেকে আরবিভাষার কায়দাকানুন উৎসারিত হতো, যা ভাষাবিদদের কিতাবাদিতে সংকলিত থাকত। তৎকালীন আরবরা শাহাদাতের বাক্য-দুটি বুঝেছিলেন এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমাটি অনুধাবন করেছিলেন। অর্থাৎ প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং ইবাদত শুধুই মহান রবের। কারণ নবীজি যখন কাফেরদের তাওহিদের প্রতি আহ্বান করে সাক্ষ্য তলব করতেন, তখন কাফেররা বলত—'সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে?'[১১১]

  আরবরা বুঝতে পেরেছিলেন শাহাদাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যান্য উপাস্য প্রত্যাখ্যান করা। এই যখন তৎকালীন কাফেরদের উপলব্ধি, তাহলে বুঝুন, তখনকার মুসলমানের বোধগম্যতা কেমন ছিল!

  উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে শাহাদাতের বাক্য-দুটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের জ্ঞানার্জন করা জরুরি, যাতে বান্দা এর চাহিদা মাফিক আমল করতে পারে, এবং ঈমান ভঙ্গ হতে পারে এমন যেকোনো কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

  পূর্বোক্ত আলোচনার হাকিকত হচ্ছে- এমন বিষয় স্পষ্ট করা, যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর থেকে উপকৃত হতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি শাহাদাতের বাক্য-দুটি

---

[১০৯] সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৫২

[১১০] হাদিসটি মুসলিম রহ. উসমান রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন।

[১১১] সুরা সোয়াদ, আয়াত ৫

মুখে উচ্চারণ করবে, তার উপরই পার্থিব বিধানাবলি প্রয়োজ্য হবে এবং ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে—যতক্ষণ তার থেকে ঈমান ভঙ্গের কোনো কারণ প্রকাশ না পায়। তার হিসাবনিকাশের জিম্মাদারি আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

এই জায়গাতে এসে আমি কঠোরভাবে সতর্ক করতে চাই যে, সর্বসাধারণকে কালিমায়ে শাহাদাত-এর মর্মার্থ শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য; বিশেষত, হালজমানায় যেখানে শিরকের মহামারি মুসলিমদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, যার কারণে ঈমান ভঙ্গ হচ্ছে। তন্মধ্যে মারাত্মক কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ :

- الشرك في التشريع। অর্থাৎ শরিয়তপ্রণয়নে অংশীদারিত্ব। মানবজাতির জন্য শরিয়ত প্রণয়ন করা শুধু আল্লাহ তায়ালারই হক। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই অধিকার সংরক্ষণ করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরিক করেন না।'[১১২] যে ব্যক্তি রবের অনুমতি ব্যতীত মানবজাতির জন্য বিধান প্রণয়ন করল, সে যেন নিজেকে তাদের প্রভু ঘোষণা করল। মানুষের যাপিত জীবনবিধান প্রণয়নে সে যেন নিজেকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করল। আল্লাহ বলেন : 'তাদের কি এমন শরিক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সেই ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ তাদের দেননি?'[১১৩] দীনের এক অর্থ হলো মানুষের জীবনদর্শন ও তাদের জীবনবিধান; তা হক হোক কিংবা বাতিল। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কাফেরগোষ্ঠীর পালনীয় যেসমস্ত কুফুরি ও গোমরাহি বিধান রয়েছে- সেগুলোকেও দীন শব্দে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'তোমাদের দীন তোমাদের জন্য, আমার দীন আমার জন্য।'

হালজমানায় শরিয়াপ্রণয়নে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করার কিছু চিত্র নিম্নরূপ :

মানবরচিত আইনপ্রণয়নের অধিকারে মানুষেরই একটি দলের অনুপ্রবেশ। তন্মধ্যে রয়েছে- মানবরচিত আইনপ্রণয়নকারী, আইনবিশেষজ্ঞ, সংসদসদস্য ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। বাস্তব অর্থে এরা হলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিধান প্রণয়নকারী স্বঘোষিত নেতা। সাধারণ জনগণ এতো বড় শিরক সম্পর্কে একেবারে বেখবর। সংসদীয় নির্বাচন এবং রাষ্ট্রসরকার গঠনে ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নেতা মনোনয়নে শরিক হচ্ছে। অথচ এই গোটা প্রক্রিয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবি পরিপন্থি। সাধারণের

---

[১১২] সুরা কাহাফ, আয়াত ২৬

[১১৩] সুরা শুরা, আয়াত ২১

মাঝে অনেকেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্ম না-জেনেই এই শিরকে লিপ্ত হচ্ছে। আর তাদের মধ্যে যারা বিষয়টা বুঝতে পারছে, তারা নিজেকে সজাগ রেখেছে। সাধারণ মানুষকে কালিমায়ে শাহাদাত-এর মর্ম শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব বুঝতে উপর্যুক্ত আলোচনাটি যথেষ্ট।

- الشرك في التحاكم। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন ও সংবিধানের আলোকে ফয়সালা করা। এই প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করে আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

  اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۗ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

  আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও। তারা তাগুতের কাছে বিচারকার্যের ফয়সালা নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের তাগুতকে অস্বীকার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।[১১৪]

  ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন : ‘আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিয়েছেন, যারা নিজেদের বিরোধ নিষ্পত্তি ও সালিশির জন্য রাসুলের আনীত বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধানের শরণাপন্ন হয়, তারা প্রকারান্তরে তাগুতকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নিল এবং তার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করল।

  ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাগুত—প্রত্যেক এমন উপাস্য কিংবা অনুসৃত বা মান্যবরকে বলা হয়, যার আনুগত্য করার ক্ষেত্রে মানুষ সীমালংঘন করে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের তাগুত হলো ওই ব্যক্তি, সম্প্রদায়ের লোকজন আল্লাহ ও তার রাসুলকে বাদ দিয়ে যাকে নিজেদের বিচারকার্যের ফয়সালাকারী নিযুক্ত করে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উপাসনা করে। রবের প্রতি অজ্ঞতাবশত তারা তাগুতের গোলামি করে। কখনো তারা তাগুতের আনুগত্য করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তাদের জানা নেই যে, এটা আল্লাহর বিধান। এরাই হলো বিশ্বখোদাদ্রোহী। যদি তুমি তাদেরকে এবং তাদের সাথে মানুষের অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ফিকির কর, দেখতে পাবে—অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে তাগুতের উপাসনায়

---

[১১৪] সুরা নিসা, আয়াত ৬০

নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ ও তার রাসুলের ফয়সালা উপেক্ষা করে তাগুতকে ফয়সালাকারী নিযুক্ত করেছে। রবের অনুসরণ-অনুকরণ বলয়ের বাইরে গিয়ে তাগুতের অনুকরণ-অনুসরণের জালে আটকে আছে।[১১৫]

- الشرك بعبادة الاموات من دون الله تعالى মৃতব্যক্তির ইবাদত করে আল্লাহর ইবাদতে অংশীদারিত্ব করা। তথা মৃত কবরবাসীকে ডাকা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, তাদের নামে মানত মানা, পশু জবাই করা; এই সমস্ত কর্মকাণ্ড বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। বড় বড় মুসলিমশহরগুলোতে এই মহামারি প্রকট আকার ধারণ করেছে। আল্লাহ বলেন :

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿۱۳﴾ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ

ইনি আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তারই। তার পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শোনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।[১১৬]
সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কালিমায়ে তাওহিদের মর্ম জানা আবশ্যক, যাতে নিজেকে শিরক থেকে রক্ষা করতে পারে।

দুই.

ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের ইলম অর্জন করা তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবী-রাসুল ও আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং ভালো-মন্দ তাকদিরের প্রতি ঈমান আনা। হাদিসে জিবরাইলের ভাষ্যমতে এগুলো হলো ঈমানের রোকন বা স্তম্ভ। এই রোকনসমূহ জানা থাকা সত্ত্বেও দুটি বিষয়ে সচেতনতা জরুরি।

১. ঈমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি, যা বাড়ে, কমে।[১১৭] অর্থাৎ অন্তর ও জবানের স্বীকারোক্তি এবং হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্ম। সুতরাং অন্তরের

---

[১১৫] ইলামুল মুআক্কিন : ১/৫০

[১১৬] সুরা ফাতির, আয়াত ১৩, ১৪

[১১৭] মৌলিক ঈমানের ভেতরে হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। এটা ইমাম আবু হানিফার মাজহাব। শাফেয়ি এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাদের দলিল হলো কুরআন ও সুন্নাহর কিছু নসের 'জাহেরি' শব্দ। সেখানে সুস্পষ্টভাবেই ঈমানের ব্যাপারে 'হ্রাস'-'বৃদ্ধি' ইত্যাদি

স্বীকারোক্তি হলো ঈমানকে জানা এবং এমন দৃঢ় সত্যায়ন করা, যা আনুগত্য ও অনুবর্তিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর জবানের স্বীকারোক্তি হলো, মুখে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করা।

কলবি ইবাদত হলো ইখলাস, তাকওয়া, মহব্বত ও আনুগত্যপরায়ণতা। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম হলো, আল্লাহ যা করতে আদেশ করেছেন এবং যে কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা যথার্থভাবে সম্পাদন করা। (আর এটাও জেনে রাখা যে) নেকআমলের দ্বারা ঈমান বাড়ে আর বদআমলের দ্বারা ঈমান হ্রাস পায়; একপর্যায়ে নেকআমলের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

২. নবীজির তিরোধানের পর থেকে আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-ফিকিরে উম্মত শতধা বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি দল মুক্তি পাবে, অন্য দলগুলো ধ্বংস হবে, শাস্তির শৃঙ্খলে আটকে যাবে। নবী আলাইহিস সালাম ও তার সাহাবিদের প্রদর্শিত পথে পরিচালিত মুক্তিকামী বাহিনীর নাজাত মিলবে। এরাই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। আর নবী আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরামের প্রদর্শিত পথ উপেক্ষা করে নিত্যনতুন ধ্যানধারণা উদ্ভাবনের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত দলগুলো গোমরাহিতে নিমজ্জিত হবে।

এই বিভক্তির বিষয়টা সামনে রাখলে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বুঝে আসে। বিভিন্ন দেশে পথভ্রষ্টতা ও বিদআতের ছড়াছড়ির মূল কারণ এটাই। আর এটাই হলো সেই সতর্কবার্তা, যার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। এই মতবিরোধ-মতপার্থক্য নিয়ে আলোচনা করার ফায়দা হলো, ওই সমস্ত আকিদা-বিশ্বাস শিক্ষা করা আবশ্যক, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুগামী।

তিন.

তাওহিদের প্রকারভেদ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। তাওহিদ বলা হয়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এটা হলো ঈমানের ছয় স্তম্ভের প্রথমটি। তাওহিদ দু' প্রকার :

(১) তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ, যাকে توحيد المعرفة والاثبات أو التوحيد العلمي الخبري। বলা হয়। অর্থাৎ একথার বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর সত্তা একক। নিজ

শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে তাহকিক করে দেখা গেছে এই মতবিরোধ কেবলই শাব্দিক। অর্থাৎ হাকিকতে মতবিরোধ নেই। কারণ যারা বলেন ঈমানের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তাদের উদ্দেশ্য হলো 'মুতলাকুল ঈমান' (ন্যূনতম ঈমান; আমল অন্তর্ভুক্ত নয়) অর্থাৎ যতটুকু ঈমান আনা জরুরি সেখানে কম-বেশি নেই। যারা বলেন, ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ঈমানে মুতলাক' (পূর্ণ ঈমান ও আমল)-এ কম-বেশি ঘটে থাকে।

কাজকর্ম, নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরিক নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার কোনো তুল্য নেই। এ বিশ্বাসও থাকতে হবে যে আল্লাহ তায়ালা আসমানের উপর আরশে সমাসীন।[১১৮] মাখলুক থেকে পৃথক। তিনি তার ইলম, কুদরত, উপলব্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে মাখলুককে পরিবেষ্টন করে আছেন।

---

[১১৮] আল্লাহ আরশের উপরে 'ইসতিওয়া' অর্থ এটা নয় যে, তিনি কোনো স্থানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার শান-শওকত, সমুন্নতি ও অমুখাপেক্ষিতা বুঝানো উদ্দেশ্য। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা; আরশ হচ্ছে সৃষ্টি। আল্লাহর কোনো শুরু নেই, শেষও নেই; কিন্তু আরশের শুরু আছে, শেষও আছে। আরশ মাখলুক। তাহলে কীভাবে আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হতে পারেন! আবু হানিফা রহ. যথার্থই বলেছেন-

لو كان في مكان محتاجا للجلوس و القرار فقبل خلق العرش أين كان الله

যদি তিনি কোনো স্থানে থাকতেন, বসা ও অবস্থান গ্রহণ করার দিকে মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে প্রশ্ন জাগে, আরশ সৃষ্টির আগে তিনি কোথায় ছিলেন? (আল-ফিকহুল আবসাত)

আল্লাহ আরশের উপরে রয়েছেন। এই কথার অর্থ কী? এর অর্থ এই নয় যে তিনি স্থানগত দিক থেকে উপরে রয়েছেন। কারণ, তিনি সর্বপ্রকার স্থান থেকে পবিত্র। সুতরাং বোঝা গেল এখানে 'ইসতিওয়া'র বাহ্যিক অর্থ মাকসাদ নয়। তাহলে অর্থ কী? আহলে সুন্নাহর অনেকে বলেন, এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। আবার অনেকে এর দ্বারা আল্লাহর মর্যাদাগত উচ্চতা উদ্দেশ্য নেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালা সুউচ্চ ও মহান। উভয় দলই হক।

তবে কতিপয় আলেমকে 'ইসতিওয়া আলাল আরশ'র আক্ষরিক অর্থ করতে দেখা যায়। তারা বলে থাকে, আল্লাহ আক্ষরিক ও সরল অর্থেই উপরে রয়েছেন; তবে তার ধরন ও পদ্ধতি অজানা, যা নিতান্তই বিভ্রান্তিমূলক। তাদের সাথে আহলে সুন্নাহর পার্থক্য হলো, আহলে সুন্নাহ প্রকৃত অর্থকেই আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেন। আর দেহবাদীরা আক্ষরিক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়ে পদ্ধতি ও ধরনকে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করেন। দেহবাদীদের বিভ্রান্তিমূলক অপব্যাখ্যার খণ্ডনে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বক্তব্যই যথেষ্ট।

وَكَانَ يَقُول إن الله عز وَجل مستو على الْعَرْش الْمجِيد ... وَكَانَ يَقُول فِي معنى الاسْتوَاء هُوَ الْعُلُوّ والارتفاع وَلم يزل الله تَعَالَى عَالِيا رفيعا قبل أَن يخلق عَرْشه فَهُوَ فَوق كل شَيْء والعالي على كل شَيْء وَإِنَّمَا خص الله الْعَرْش لِمَعْنى فِيهِ مُخَالف لسَائِر الْأَشْيَاء وَالْعرش أفضل الْأَشْيَاء وأرفعها فامتدح الله نَفسه بِأَنَّهُ على الْعَرْش استوى أَي عَلَيْهِ علا

তিনি বলেন-নিশ্চয় মহান আল্লাহ মহিমাময় আরশে সমুন্নত। ইসতিওয়ার অর্থ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সমুন্নত হওয়া ও সুউচ্চ হওয়া। আল্লাহ তার আরশ সৃষ্টির আগে থেকেই সুউচ্চ ও সমুন্নত। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে ও উপরে। আল্লাহ আরশকে বিশেষায়িত করেছেন। কারণ, অন্য সবকিছুর মোকাবেলায় তার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। আরশ সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ বস্তু। এ কারণে আল্লাহ নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, তিনি আরশের উপর ইসতিওয়া করেছেন। অর্থাৎ তার উপর সমুন্নত হয়েছেন। (আবু বকর আল-খাল্লাল রচিত : আল-আকিদা : ১০৭, ১০৮, শামেলা)

সুতরাং বোঝা গেল, যেসব আয়াত ও হাদিসে আল্লাহর সত্তাকে আরশের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, এগুলোর অর্থ এটা নয় যে, তিনি আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন। বরং এগুলো দ্বারা রব্বে কারিমের সমুন্নত মর্যাদা, মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করা মাকসাদ। (অনুবাদক)

এ বিশ্বাসও রাখবে যে 'তার অনুরূপ কেউ নেই; তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'[১১৭] তিনি একমাত্র রব, সবকিছুর মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা। উপকার ও ক্ষতি সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণে। তিনি জীবন দান করেন, মৃত্যুর দিনক্ষণ তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, সৃষ্টিকূলের কল্যাণে তিনিই শরিয়ত প্রবর্তন করেন; এতে তার সাথে কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহর পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় যা কিছুই ঘটে সব কিছু তার ইচ্ছাতেই ঘটে—উপর্যুক্ত বিশ্বাসের পাশাপাশি এই বিশ্বাস থাকা যে, আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। কোনো কিছুর ব্যাপারে তিনি অক্ষম নন।

কোনো কোনো লেখক 'তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত'কে 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আবার কেউ একে স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদিও এভাবে ভাগ করলে 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ' আল্লাহর জাতিসত্তা এবং তার কার্যবিধিতে সীমাবদ্ধতা এসে পড়ে। তাওহিদের প্রকারভেদ যেরকমই হোক না কেন, আমি সতর্কতামূলক এ কথাই বলব যে, 'তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত' তথা নাম ও গুণাবলির বিশ্লেষণ শুধুই তাত্ত্বিক, যা আহলে সুন্নাত ও আহলে বিদআতের মতাদর্শের বয়ানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত বিশ্লেষণকালে আমাদের জন্য জরুরি হলো, মুসলমানদের যাপিত জীবন এবং দৈনন্দিনের দৃশ্য-অদৃশ্য সমগ্র মুয়ামালাতের সাথে এর গভীর বন্ধন তৈরি করা। যেমন 'আল্লাহ তার সাথে আছেন' এই সিফাতের ইলম থাকলে মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত হতে লজ্জাবোধ করবে। সেই সাথে তার অন্তরে মুত্তাকিদের মতো হওয়ার জন্য আশা জাগবে এবং সে তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাকে দেখছেন এই অনুভূতি থাকলে সে আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হতে লজ্জাবোধ করবে। ফলে সে আল্লাহ তায়ালার অনুগত থাকবে। শ্রবণের সিফাত জানার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বান্দা এমন কথা পরিহার করবে, যদ্দরুন তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। তখন তার কথাবার্তা রবের মানসা মোতাবেক হবে। এরকমভাবে আল্লাহর কুদরত নামক সিফাত, তার উপর ভরসা করা এবং তার প্রতিশ্রুতির উপর আস্থাশীল থাকা- এসমস্ত গুণ জানার দ্বারা রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা। এ ছাড়া অন্যান্য তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাতও কল্যাণকর বিষয় থেকে খালি নয়। গোটা পৃথিবীতে যে সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তু রয়েছে, সেগুলোর আছে প্রাচীন নিদর্শন এবং এগুলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলির সাক্ষ্য ধারণকারী।

---

[১১৭] সুরা শুআরা, আয়াত ১১

কেননা, আল্লাহ তায়ালার এই সমস্ত নাম ও গুণাবলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের বাহ্যত নিদর্শন থাকবে না; এটা অসম্ভব। আর আল্লাহ্ তায়ালার নাম ও গুণাবলির পার্থিব জগতে স্মৃতিধারণকারী নিদর্শনাবলির জ্ঞানার্জন হলো উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা। ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ এভাবেই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

(২) তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ, যাকে توحيد العبادة والقصد أو التوحيد الإرادي الطلبي। বলা হয়। অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য হওয়া। যেমনটি আমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যায় আলোচনা করে এসেছি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে পরিদৃশ্যমান হয়, তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ্ হলো 'ইলম' আর তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ হলো 'আমল'। আমলের মাধ্যমেই 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ'র নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে থাকে। তাওহিদ ও ঈমান পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য একসাথে উলুহিয়্যাহ ও রুবুবিয়্যাহ পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। শুধু 'রুবুবিয়্যাহ'র ইলম দিয়ে বান্দা মুমিন হতে পারবে না। কারণ, যেই কাফেরগোষ্ঠীর সাথে নবী আলাইহিস সালামের লড়াই হয়েছিল, তিনি তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল ও বৈধ সাব্যস্ত করেছিলেন, তারাও কিন্তু 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ' স্বীকার করত;[১২০] তারা স্বীকার করত আল্লাহ তায়ালা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তার কোনো অংশীদার নেই। লাভ-ক্ষতির মালিক তিনিই। সবকিছু পরিচালনা তিনি করে থাকেন। যেমন : আল্লাহ্ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন :

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

তুমি জিজ্ঞেস কর—তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে কে রুজি দান করে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তা ছাড়া কে

---

[১২০] আলমেগণ তাওহিদকে দুভাগে ভাগ করছেনে। ক. রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ। আরবের মুশরিকরা তাওহিদুল উলুহিয়্যাহতে শরিক করত। আর তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর কিছু বিষয় না মানলেও এর মৌলিক দিকগুলো স্বীকার করত। তবে পুনর্জীবন, কেয়ামত, হাশর, বিচারদিবস এগুলো তারা স্বীকার করত না। অথচ এগুলোও তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর অংশ। তবে যেগুলো তারা মানত, কুরআনে কারিমের আয়াত সেগুলো তুলে ধরে। অন্য যেগুলো অস্বীকার করত, সেটার প্রতি এ বৈষম্য চিন্তা পালটাতে বলছে। বলা হয়েছে, যখন তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছ সমগ্র জাহানের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ তায়ালাই করেন, তখন কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উপাসনা কর? এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? তোমরা কি এই মহাপরাক্রমশালীকে একটুও ভয় কর না? (আত-তাফসিরুল মুনির, আল্লামা যুহাইলি, ১২/৭। আল-আকিদাতুল ইসলামিয়া, মুসতফা সাইদ, পৃষ্ঠা ১৭২)

জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন? কে করেন কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না?[১২১]

এই স্বীকারোক্তি তাদের ইসলামে প্রবেশ করাতে পারেনি। কেননা, তারা গাইরুল্লাহর ইবাদত করে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে অংশীদার স্থাপন করত। তারা গাইরুল্লাহকে ডাকত, তাদের সাহায্য প্রার্থনা করত, তাদের নামে মানত মানত এবং পশু জবাই করত, আল্লাহর প্রবর্তিত শরিয়ত বাদ দিয়ে ফয়সালার জন্য ভিন্ন বিধানের শরণাপন্ন হতো।

এ কারণেই নবীগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে প্রথমে আহ্বান করেছেন এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তার সাথে কাউকে শরিক না করতে। এটাই হলো 'তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ'। যেমন, আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারিমে বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।[১২২]

নবীজি আলাইহিস সালাম মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় তাকে সম্বোধন করে বলেন : 'তুমি আহলে কিতাবের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সর্বাগ্রে তুমি তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে।'[১২৩] এই আহ্বানের মূল মাকসাদ হচ্ছে 'তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ', যা উক্ত হাদিসের অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়। যেমন, এক বর্ণনায় এসেছে; 'সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করবে।'[১২৪]

আরেক বর্ণনায় আছে, 'যখন তুমি তাদের নিকট পৌঁছবে, তাদেরকে এ কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে- আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।'[১২৫]

এই সমস্ত আলোচনায় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তাওহিদের অনিবার্যতা সর্বাগ্রে। তাওহিদের যথাযথ চর্চা ছাড়া ইবাদত পরিশুদ্ধ হয় না, গ্রহণযোগ্যতা পায় না। তাই আল্লাহর রাসুল 'হাদিসে মুয়াজে' প্রথমে তাওহিদের প্রতি ঈমান আনার পর ইসলামের অন্যান্য রোকনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। নবী আলাইহিস সালাম

---

[১২১] সুরা ইউনুস, আয়াত ৩১
[১২২] সুরা নাহল, আয়াত ৩৬
[১২৩] বুখারি শরিফ : ৭৩৭২,
[১২৪] বুখারি শরিফ : ১৪৫৮
[১২৫] বুখারি শরিফ : ৪৩৪৭

বলেন : (মুয়াজ) সর্বাগ্রে তুমি এক আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেবে। যখন তাদের কাছে একত্ববাদের বিষয়টি স্পষ্ট হবে তখন তাদেরকে সালাত কায়েমের কথা বলবে। আল্লাহ তাদের উপর দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। তারা যখন সালাত আদায় করবে, তাদের বলো, আল্লাহ তাদের উপর সম্পদের জাকাত আবশ্যক করেছেন, যা ধনীদের থেকে নিয়ে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যখন এই প্রস্তাব তারা মেনে নেবে, তাদের থেকে সম্পদ গ্রহণ করবে; তবে উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে।[১২৬]

সুতরাং প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য হলো তাওহিদের প্রকার জানা, যেগুলোর সমন্বিত বিশ্বাস ও আমল ছাড়া ঈমান শুদ্ধ হয় না। বান্দার উপর যেসমস্ত দীনি ইলম ও আমল শিক্ষা করা আবশ্যক, এই তাওহিদ হলো তার প্রথম ধাপ।

চার.

معرفة نواقض الإسلام অর্থাৎ যে কথা ও কাজ মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় তার ইলম অর্জন করা। তাই কুফুর ও কুফুরি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে হবে। আর এগুলোর ব্যাপারে অবহিত থাকা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।[১২৭]

'তাগুত' কী তা জানতে হবে, যাতে বান্দা সজ্ঞানে তা পরহেজ করে চলতে পারে। কেননা, ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না বান্দা তাগুতের গোলামি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে এবং একে প্রত্যাখ্যান করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى * لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে তাগুত অস্বীকার করল, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল, সে আঁকড়ে ধরে আছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙার নয় আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন। (বাকারা : ২৫৬)

---

[১২৬] হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত হাদিসের শব্দটি বুখারির; ৭৩৭২

[১২৭] সুরা নাহল, আয়াত ৩৬

আয়াতে তাগুত বর্জন করার বিষয়টি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কারণ, তাগুত বর্জন করা হলেই ঈমান আনা পরিশুদ্ধ হবে। আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্যে আল্লাহ ছাড়া বাকি যে ইলাহকে অস্বীকার করা হয়েছে, তাগুত অস্বীকার করার দ্বারা সেই অস্বীকারই উদ্দেশ্য।

طاغوت (তাগুত) শব্দটি الطغيان থেকে নির্গত। আর তাগুত বলা হয়- প্রত্যেক এমন উপাস্য কিংবা অনুসৃত ব্যক্তিকে, যার আনুগত্য করার ক্ষেত্রে মানুষ সীমালংঘন করে। অথবা যে মানুষকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে কুফুরের দিকে ধাবিত করে। এটাই হলো الطغيان এর মূল হাকিকত। 'তাগুত'-এর সংজ্ঞা নিরূপণে ইতিপূর্বে ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য আলোচিত হয়েছে। ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ 'তাগুত'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাবারির সূত্রে বর্ণনা করেন, তাবারি রহিমাহুল্লাহ বলেন : 'আমার নিকট সঠিক হলো, 'তাগুত' বলা হয় প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারীকে, আল্লাহর সাথে সীমালঙ্ঘন করে যার ইবাদত করা হয়—ইবাদতটা উপাস্য কর্তৃক জবরদস্তি করার কারণে হোক কিংবা তার প্রতি আনুগত্যের প্রবণতা থেকে। পূজনীয় সত্তা মানুষ হোক বা শয়তান অথবা হোক প্রাণী বা প্রাণহীন জড়পদার্থ।[১২৮]

অধিকাংশ আলেম বলেন : তাগুত হলো মূলত 'শয়তান', যে মানুষের সামনে প্রভুর নাফরমানিকে সুসজ্জিত করে তোলে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইবলিসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ

সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব, আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত।[১২৯]

লোকমান আলাইহিস সালাম তার পুত্রকে প্রথম যে নসিহতটি করেছিলেন, যেমনটি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۔اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল, 'বৎস, আল্লাহর সাথে শরিক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরিক করা মহা অন্যায়।'[১৩০]

---

[১২৮] ফাতহুল বারি : ১১/৬৫৭৩, পৃষ্ঠা নম্বর : ৪৪৮

[১২৯] সুরা হিজর, আয়াত ৩৯, ৪০

[১৩০] সুরা লুকমান, আয়াত ১৩

শিরক শব্দটিকে যখন কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন শিরক দ্বারা কুফুর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

সুতরাং কুফুরকে জানা এবং বান্দার কুফুরি কর্মকাণ্ডের পরিচয় লাভ করা ওয়াজিব; অর্থাৎ ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ জানা। এই কারণগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ নয়।

পাঁচ.

معرفة عبادات القلب الواجبة এটা এমন একটা বিষয়, যার ব্যাপারে অবহিত থাকা জরুরি হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই এ-ব্যাপারে উদাসীন। মূল ঈমানের অনুষঙ্গে এর সিংহভাগের অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। যেমন :

(১) ইখলাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে আল্লাহর ইবাদত করবে।[১৩১]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি হলো, ইখলাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কারণ, ইখলাস হলো আল্লাহর নিকট আমল কবুলের পূর্বশর্ত। আমল বলতে সালাত, জাকাত, ইত্যাকার বিষয়। কখনো কখনো জগৎসংসারে ইখলাসবিহীন আমলকে দৃশ্যত সঠিক বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তা আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য। ইখলাসের অনুপস্থিতির কারণে আমলকারী বিনিময় থেকেও বঞ্চিত হয়। ইখলাস বলা হয়—একমাত্র আল্লাহর জন্য আমলের প্রয়াসী হওয়া। এটাকেই বলা হয় আমলে কলবি তথা আত্মিক আমল।

(২) ভয়। রব্বে কারিম বলেন :

فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অথচ তোমাদের ভয়ের অধিক যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। সুরা তাওবা, আয়াত ১৩

(৩) মহব্বত। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।[১৩২]

---

[১৩১] সুরা বাইয়িনা, আয়াত ৫
[১৩২] সুরা বাকারা, আয়াত ১৬৫

নবীজি বলেন, 'তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। দুনিয়ার সবকিছু থেকে আল্লাহ ও তার রাসুলকে সে বেশি ভালোবাসবে। কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসবে তো আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। কুফুর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পর কুফুরিতে ফিরে যেতে এমনভাবে অপছন্দ করবে, যেমনিভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে সে অপছন্দ করে।'[১৩৩]

আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসা মুখের কোনো বুলি নয়; বরং হাকিকি কথা হলো, এটা ইবাদতে কলবি তথা আত্মিক ইবাদত, যা প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রিয়জনের অপছন্দের বিষয়াদি ঘৃণা করতে উৎসাহিত করে। (যার বাস্তবায়ন ঘটে) আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, তা পালন করে এবং যেই কাজ করতে বারণ করেছেন, তা থেকে বিরত থেকে।

কাজি ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ নবী আলাইহিস সালামকে মহব্বত করার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন : আল্লাহ তায়ালার বাণী-

> قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
>
> বলো, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ ও তার রাসুল ও তার রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।[১৩৪]

নবী আলাইহিস সালামকে ভালোবাসার বাধ্যবাধকতা, ফরজ পরিমাণ মহব্বতের আবশ্যকতা, মহব্বতের সংকটে ভয়াবহতা এবং মহব্বত লাভের ক্ষেত্রে নবী আলাইহিস সালামের উপযুক্ততা প্রমাণে উপর্যুক্ত আয়াতটি দলিল হিসেবে যথেষ্ট, উৎসাহ ও উপদেশের ক্ষেত্রে জুতসই। কেননা, যাদের ধনসম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ ও তার রাসুল থেকে অধিক প্রিয়, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে (উক্ত আয়াতে) তিরস্কার করেছেন। তাদেরকে ভীতি

---

[১৩৩] বুখারি ও মুসলিম।

[১৩৪] সুরা তাওবা, আয়াত ২৪

প্রদর্শন করেছেন এ কথা বলে যে-فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ- (তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত)।

এরপর আয়াতের শেষে আল্লাহ্ ওইসব লোককে ফাসেক হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, তারা পথভ্রষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত। রব তাদের পথপ্রদর্শন করবেন না।[১৩৫]

তারপর কাজি ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ্ নবীজিকে মহব্বত করার আলামত বিষয়ক পরিচ্ছেদে বলেন : জানা থাকা উচিত, যার মধ্যে কোনো বস্তুর মহব্বত থাকে, সে সেটাকে অগ্রাধিকার দেয়, এমনকি এর সাজুয্য বস্তুও তার কাছে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যদি সে তার ভালোবাসায় সত্যবাদী না হয়, তাহলে সে নিছক দাবি উত্থাপনকারী। নবী আলাইহিস সালামের ভালোবাসায় সত্যবাদী তো ওই ব্যক্তি, যার থেকে এর আলামত প্রকাশ পায়।

প্রথম আলামত হচ্ছে রাসুল সা.-এর অনুসরণ করা এবং তার সুন্নাহর বাস্তবায়ন ঘটানো। তার কথা ও কাজের পাবন্দি করা। যেসকল কাজ করতে নবী আলাইহিস সালাম আদেশ করেছেন, তা পালন করা। যেসব কাজ বারণ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। জটিলতা ও সহজসাধ্যতা এবং উদ্যম ও হতোদ্যম—সর্বাবস্থায় তার শিষ্টাচার ধারণ করা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী—'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসেন।'[১৩৬]

(নবীকে ভালোবাসার আরও আলামত হলো) নবী আলাইহিস সালামের আনীত বিধানাবলি অগ্রাধিকার দেওয়া, নফসের কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়ে নববি বিধানের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা। রব্বে কারিম বলেন : 'যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বাস করেছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না। এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।' যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফল। (হাশর : ৯) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে বান্দার রোষানল উপেক্ষা করা।

পরিশেষে কাজি ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ্ বলেন : নবীজিকে মহব্বতের আরেকটি আলামত হলো, আল্লাহ্ ও তার রাসুল যা অপছন্দ করেন, তা অপছন্দ করা। যার সাথে শত্রুতা পোষণ করেন, তাকে শত্রু মনে করা। যে সুন্নাহবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় এবং দীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে তাকে এড়িয়ে চলা।

---

[১৩৫] আশ-শিফা : ২/৫৬৩

[১৩৬] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১

সর্বোপরি শরিয়তপরিপন্থি প্রতিটি জিনিস ঘৃণা করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না।"[১৩৭]

আয়াতের আলোচিত ব্যক্তিরাই হলেন নবীজির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় প্রিয়জনদের সাথে যুদ্ধ করেছে, বাপ-দাদা ও সন্তানসন্ততির বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়েছে।[১৩৮]

কাজি ইয়াজ রহিমাহুল্লাহর বক্তব্যের মূল মাকসাদ হলো এ বিষয়টি তুলে ধরা যে, মহব্বত-ভালোবাসা যদিও গুরুত্বপূর্ণ কলবি ইবাদত, তবে এর এমন কিছু অবিচ্ছেদ্য আমল রয়েছে, যা সম্পাদন করতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন পড়ে; এবং তা সম্পন্ন করা জরুরিও।

মহব্বতের ব্যাখ্যায় এতোক্ষণ যা বলা হলো, অন্যান্য কলবি ইবাদতের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে। যেমন : সন্তুষ্টি, দ্বিধাহীন আনুগত্য ইত্যাদি।

(৪) আশা ও ভয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

তাকে আহ্বান কর ভয় ও আশা নিয়ে।[১৩৯]

(৫) আল্লাহর উপর ভরসা করা। রব্বে কারিম ইরশাদ করেন :

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

আর আল্লাহর উপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত।[১৪০]

(৬) আনুগত্যের উপর অটল থাকা, মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা, নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা। রব বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।[১৪১]

শাইখ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম রহিমাহুল্লাহ বলেন : কলবি ইবাদত অসংখ্য। তন্মধ্যে রয়েছে- আল্লাহর প্রতি সুধারণা, ছুটে যাওয়া ইবাদতের প্রতি দুঃখপ্রকাশ, দয়া ও অনুগ্রহের উপর উচ্ছ্বাস, ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং কুফুর, পাপাচার ও অবাধ্যতার প্রতি বিকর্ষণ; বিপদআপদ ও নেক আমলে

---

[১৩৭] সুরা মুজাদালা, আয়াত ২২

[১৩৮] আশ-শিফা : ২/৫৭১-৫৭৬ (ঈসা আল-হালাবি)

[১৩৯] সুরা আরাফ, আয়াত ৫৬

[১৪০] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬০

[১৪১] সুরা বাকারা, আয়াত ১৫৩

অটল-অবিচল থাকা, অবাধ্যতা ও বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকা; বিনয়, নম্রতা, মিনতি, খুশু-খুজু, জিকির, চেতনাবোধ ও পুণ্যকাজে পুণ্যবানদের আনন্দ প্রকাশ, কল্যাণকর কাজে কল্যাণকামীদের উচ্ছ্বাস প্রদর্শন, খোদাভীতি ও ধার্মিকতায় মুত্তাকিদের প্রবল ভাবাবেগের বিকাশ।

উক্ত বিষয়াবলির বিপরীত কাজ থেকে বিরত থাকাও ইবাদতে কলবিয়্যার অন্তর্ভুক্ত। কলবি ইবাদতের মধ্যে আরও আছে- আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ পোষণ করা, মুমিনদের জন্য তা-ই পছন্দ করা, যা নিজের জন্য পছন্দ করা হয়, আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করা হয়, সেগুলো মুমিনদের জন্যও অপছন্দ করা; নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করা, যখন বান্দাকে নাফরমানি ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে আহ্বান করা হয়; মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা, আসমানের মালিকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টি স্মরণ করা।

এ ছাড়াও আমলে কলবি আরও হলো, স্রষ্টার বশ্যতায় আনন্দিত হওয়া, নাফরমানিতে বিষণ্ণতা অনুভব করা। কেননা মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- নেক কাজে সে আনন্দিত হবে আর নাফরমানিতে বিষণ্ণতা অনুভব করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীত ও ভবিষ্যতের যে সংবাদ প্রদান করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনাও ইবাদতে কলবিয়্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হিতকামনা করা, প্রবৃত্তির অনুসরণে নফসের যে প্রবণতা, এর নিয়ন্ত্রণে ভীতিকর বিষয় সম্মুখে হাজির করা। বান্দা যখন প্রভুর ইবাদত করবে, মনে করবে সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে, যাতে ইবাদত পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন হতে পারে। যদি বান্দার পক্ষে এরকমটা কঠিন হয়, অন্তত এটা ভাববে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন, তার ব্যাপারে অবগত আছেন। আর তাই হবে প্রকৃত ইবাদত।[১৪২]

এই হলো অবশ্যপালনীয় আত্মিক ইবাদত তথা ইবাদতে কলবিয়্যার কিছু দৃষ্টান্ত, যেগুলোর চর্চা ছাড়া বান্দার আত্মিক অবস্থার পূর্ণতা আসে না। এর মাধ্যমেই বান্দার হৃদয়ে উর্বরতা আসে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ইবাদতের প্রতি উদ্যমী হয়। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা দৈহিক আমলের মূলে রয়েছে আত্মিক আমল, যা বান্দাকে শারীরিক ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যেমন, নবী আলাইহিস সালাম বলেন, 'জেনে রাখ, প্রত্যেকের দেহে রয়েছে একটি মাংসপিণ্ড। যখন তা সচল থাকে তখন গোটা দেহ সজাগ থাকে। যখন মাংসপিণ্ডে পচন ধরে, সারা দেহ অকেজো হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, এটাই হলো কলব।'[১৪৩]

---

[১৪২] কাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম, ১/১৮৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

[১৪৩] বুখারি ও মুসলিম।

ছয়.

পবিত্রতার বিধি-নিষেধ জানা। কারণ, সালাত সহিহ হওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত। পবিত্রতার যেসমস্ত বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জরুরি, তার কিছুটা নিম্নরূপ :

১. যে পানি ব্যবহারে যথাযথভাবে পবিত্রতা হাসিল হয়, তার গুণাবলি জানা।
২. নাপাক জিনিসের পরিচয় এবং তা দূর করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা।
৩. ইসতেনজার অবধারিত হুকুম সম্পর্কে অবহিত থাকা।
৪. ওয়াজিব গোসল তথা জানাবাত, হায়েজ ও নেফাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
৫. স্বভাবজাত সুন্নাহ জানা থাকা। যেমন, খতনা করা, দাঁড়ি রাখা ও নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা ইত্যাদি।
৬. ওজুর ইলম শিক্ষা করা। অর্থাৎ ওজুর শর্ত, ওয়াজিব, সুন্নাত ও ওজু ভঙ্গের কারণসমূহ জানা।
৭. তায়াম্মুমের বিধান সম্যক অবগত থাকা; কখন তায়াম্মুম করার অনুমোদন রয়েছে, কীভাবে করতে হয়?

সাত.

সুরা ফাতিহা মুখস্থ রাখা। কেননা, সুরা ফাতিহা হলো সালাতের ভিত্তিমূল। এ ছাড়া কিছু ছোট সুরা মুখস্থ রাখা মুসতাহাব। যেরকমভাবে কুরআনের তাজবিদ সম্পর্কিত বিধান সম্পর্কে ধারণা রাখা মুসতাহাব, যাতে সহিহ-শুদ্ধরূপে বান্দা তেলাওয়াত করতে সক্ষম হয়।

আট.

সালাতের আহকাম জানা। কালিমায়ে তাওহিদের পর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাত হলো ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। যে সালাত ছেড়ে দিল, সে কাফের, মুরতাদ—সে সালাতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করুক কিংবা না করুক।[১৪৪] এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দলিলাদি বিদ্যমান। সাহাবিগণও এ ব্যাপারে একমত। এমনটি ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তার 'সালাত' কিতাবের প্রারম্ভে উল্লেখ করেছেন।

---

[১৪৪] ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো ব্যক্তি নামাজের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করলে বা নামাজ নিয়ে অবজ্ঞা-উপহাস করলে সে মুরতাদ ও কাফের। হ্যাঁ, কেউ যদি নামাজের ফরজ হওয়াকে স্বীকার করে, তথাপি অলসতা করে ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তাকে কাফের বলা হবে না। তবে এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে নামাজ আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া পর্যন্ত প্রহার করা, বন্দি করা ও প্রয়োজনে কঠোর শাস্তির ধমকির কথাও ফিকহের কিতাবাদিতে এসেছে। (মাউসুআতুল মাসায়িলিল জমহুর ফিল ফিকহিল ইসলামি-১/১২৭)

সালাতের আহকাম সম্পর্কে যা যা জানা আবশ্যক, তার কিছুর তালিকা :

১. সালাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ জানা। অর্থাৎ মুসলিম, বুদ্ধিমান, বালেগ হওয়া। তবে যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা হয়, কিন্তু সে ভালোমন্দ নির্ণয় করতে সক্ষম, এতে কোনো সমস্যা নেই (তার উপরও সালাতের বিধান বর্তাবে)।
২. সালাত সহিহ হওয়ার শর্ত সম্পর্কে ইলম হাসিল করা। যেমন, পবিত্রতা অর্জন করা, কিবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা, সময় হওয়া ও সালাতের নিয়ত করা।
৩. সালাতের সিফাত তথা রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ জানা।
৪. সিজদায়ে সাহুর কারণ সম্পর্কে অবগত থাকা এবং কোন বিষয়ে সিজদায়ে সাহু আদায় করতে হয়, কোন বিষয়ে হয় না- তা জ্ঞাত থাকা। সিজদায়ে সাহু আদায়ের পদ্ধতি কেমন হবে এ বিষয়েও অবহিত থাকা।
৫. কখন সালাত ফাসেদ হয় আর কখন মাকরুহ হয়, এ ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করা। এই সমস্ত অবশ্যপালনীয় বিধানের সাথে সাথে নফল সালাত এবং এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যা রয়েছে; যেমন বিতির, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত- এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা উচিত। সুন্নাতে রাতেবার বিষয়টিও এরকম। (রাতেবা বলা হয়—যে আমল নবী আলাইহিস সালাম ধারাবাহিকভাবে করেছেন তবে মাঝেমধ্যে বাদও দিয়েছেন)। কিন্তু আমল বাদ দেওয়াটা অভ্যাসে পরিণত হলে, ব্যক্তির 'আদালত' হুমকির মুখে পড়বে। সহিহ হাদিসে আছে, কেয়ামতের দিন ফরজ সালাতের ঘাটতি দেখা দিলে নফল দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করা হবে।
৬. জামাআত, জুমআ ও ঈদের বিধানাবলি সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা।

নয়.

জানাজার মাসআলা শিক্ষা করা; যদিও তা ফরজে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষ তা ফরজে আইনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন, দুজন মুসাফিরের একজন জনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় মারা পড়ল, তখন কিন্তু ওই একজনের উপর আবশ্যক হয়ে পড়ে মাইয়েতকে গোসল করানো, কাফন পরানো এবং জানাজা ও দাফন সম্পর্কিত মাসআলা শিক্ষা করা।

দশ.

জাকাতের বিধিনিষেধ জানা। এটা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এর কিছু আহকাম জেনে রাখা ওয়াজিব। যেমন, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ। যখন কারো উপর জাকাত ওয়াজিব হয়, তখন তার উপর জাকাতের বিস্তারিত বিবরণ জানা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এভাবেই জাকাতের কিছু বিধান; যেমন ওয়াজিব হওয়ার শর্ত- العلم الواجب العيني العام। (যে ইলম

শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশিষ্ট বিধানাবলি العلم الواجب العيني الخاص (এমন ইলম; যা শিক্ষা করা সবার জন্য আবশ্যক নয়, বিশেষ কিছু ব্যক্তি আদায় করলেই যথেষ্ট) এর অন্তর্ভুক্ত। সেই বিশেষ ব্যক্তিগণ এরকম হবেন, যাদের উপর জাকাত ওয়াজিব।

১. সুতরাং জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো- মুসলিম হওয়া, স্বাধীন হওয়া, নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা, নেসাবের পরিপূর্ণ মালিকানা অর্জন হওয়া, নেসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। তবে জমিনের উৎপাদিত ফসলের উপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়।[১৪৫] তাই বলা যায়- নাবালেগের সম্পদ এবং নির্বোধ পাগলের সম্পদের উপর জাকাত ওয়াজিব। কেননা, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত নয়। এটা জুমহুরের মাজহাব। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. ভিন্নমত পোষণ করেন।
২. যেসমস্ত সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হয়, তার ইলম থাকা। তা হলো- চতুষ্পদ জন্তু, যেগুলো খোলা মাঠে বিচরণ করে, জমিনের উৎপাদিত ফসল, মধু, তরল সম্পদ ও ব্যবসায়িক পণ্য। উপর্যুক্ত সম্পদের প্রত্যেক প্রকারের নেসাবের পরিমাণ জানা আবশ্যক।
৩. কাকে জাকাত দেওয়া যাবে, কাকে দেওয়া যাবে না- এ বিষয়ে অবগত থাকা।
৪. সাদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি, পরিমাণ, আদায় করার সময় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা জরুরি।

এগারো.

রোজার আহকাম শিক্ষা করা। রোজা হলো, ইসলামের একটি রুকন। প্রতিটি মুসলিমের জন্য জানা থাকা জরুরি, আল্লাহ তার উপর প্রতি বছর রমজান মাসের রোজা ফরজ করেছেন। রোজা সম্পর্কিত জানার বিষয়গুলো হলো-

১. রোজা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি। প্রতিটি মুসলিম, বালেগ, আকেল, সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর রোজা রাখা ফরজ—সে পুরুষ হোক কিংবা নারী, স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম।
২. রোজা সহিহ হওয়ার শর্তসমূহ। তথা মুসলিম, ভালো-মন্দ পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম ব্যক্তি, বুদ্ধিমান, হায়েজ-নেফাসের রক্ত বন্ধ থাকা ও নিয়ত পরিশুদ্ধ রাখা।
৩. রোজার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাওয়া; অর্থাৎ পানাহার, স্ত্রী-সহবাস ইত্যাকার বিষয় থেকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকা।
৪. হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত নারীর জন্য রোজা পালন নাজায়েজ। তারা বরং রোজা ভেঙে ফেলবে এবং পরে কাযা করে নেবে।

---

[১৪৫] ফসলের জাকাতকে উশর বলা হয়।

৫. কোন কোন কারণে রোজা বাতিল হয়, কখন রোজার কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয় এবং কখন শুধু কাযা ওয়াজিব হয়- প্রত্যেকের জন্য সে ব্যাপারে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
৬. কার জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ তাও জানতে হবে। যেমন, অসুস্থ ব্যক্তি, বার্ধক্যজনিত কারণে রোজা রাখতে অক্ষম ব্যক্তি। সফরের শর্ত বিদ্যমান এমন মুসাফির। এটাও জানা জরুরি যে, এদের মধ্য থেকে কাদের জন্য রোজা কাযা করতে হবে এবং কাদের জন্য কাযা না করে (ফিদিয়াস্বরূপ) খাবার খাওয়ালেও চলবে।
৭. রমজান মাসের সুন্নাতসমূহ; তথা তারাবিহ, ইতিকাফ, বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত ও নেকআমল করা।

বারো.

হজের আহকাম শিক্ষা করা। হজ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। প্রত্যেক মুসলমানের জানা থাকা ওয়াজিব যে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর জীবনে একবার হজ ফরজ করেছেন।

১. হজ ওয়াজিব হবার শর্তসমূহ হলো- মুসলিম, আকেল, বালেগ, স্বাধীন ও সামর্থ্যবান হওয়া। শিশু ও গোলামের হজ সহিহ হবে এবং এর প্রতিদানও দেওয়া হবে। কিন্তু এই হজের কারণে ইসলামে হজের বিধান থেকে সে জিম্মামুক্ত হবে না। বরং যখনি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হবে, গোলাম স্বাধীন হবে, তার উপর হজ করা আবশ্যক হবে। তবে উমরা ওয়াজিব কখন হবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।
২. সামর্থ্যবান হওয়া হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ সম্পন্ন করতে কোনোরূপ ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে বাইতুল্লাহয় যাতায়াত করতে সক্ষম হয়।

সামর্থ্য থাকার বিষয়টি একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম। যিনি দূরে আছেন তার ক্ষেত্রে সামর্থ্যবান বুঝাতে যা প্রয়োজন হবে, যিনি কাছে আছেন তার ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন হবে না। মহিলাদের জন্য বাড়তি কিছু শর্ত রয়েছে, যা পুরুষের জন্য প্রযোজ্য নয়।

মোটকথা হলো, হজ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। আর সামর্থ্যের বিষয়টি শরীর, সম্পদ ও রাস্তার নিরাপত্তা; সবকিছুর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে হজ করতে সক্ষম এবং বাসস্থান, চরানো মেষ, খাদেম এবং পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ তথা প্রয়োজনীয় খরচাদি থেকে অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, যার মাধ্যমে সে সফরের আসবাব ও যাতায়াত খরচ বহন করে- এমন ব্যক্তিকে সামর্থ্যবান বলা হবে। তার উপর হজ ওয়াজিব। উত্তম হলো,

সামর্থ্যবান হওয়ার সাথে সাথেই দ্রুত হজ সম্পন্ন করে ফেলা। আর মহিলাদের জন্য উপর্যুক্ত শর্তের পাশাপাশি স্বামী কিংবা এমন মাহরাম পুরুষ থাকা শর্ত, যে উক্ত মহিলার সফরসঙ্গী হতে পারে।

যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে হজ আদায় করতে সক্ষম, কিন্তু শারীরিকভাবে এমন অক্ষম যে, সক্ষমতার আশা করা যায় না। তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, তার পক্ষ থেকে হজ আদায়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করবে।

৩. যে ব্যক্তির উপর হজ পালন করা ওয়াজিব হয় এবং সে তা আদায় করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে তার জন্য অবধারিত হলো, হজের যাবতীয় আহকাম শিখে নেওয়া।

(হজ বিষয়ক) যে পরিমাণ ইলমের কথা ইতিপূর্বে গত হলো, তা العلم الواجب العيني العام (যেই ইলম প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা করা ওয়াজিব) এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যাতে মুসলিম মাত্র সকলেই জানতে পারে, কখন তার উপর হজ পালন ওয়াজিব? সুতরাং হজের বিস্তারিত বিধান শিক্ষা করা العلم الواجب العيني الخاص (সকলের জন্য যেই ইলম শিক্ষা করা জরুরি নয়, বরং বিশেষ ব্যক্তিগণ শিখলেই যথেষ্ট) এর অন্তর্ভুক্ত, যা শুধু ওই ব্যক্তিই শিক্ষা লাভ করবে, যার উপর হজ ওয়াজিব হয় এবং সে হজ আদায়ে সংকল্পবদ্ধ হয়। ফলে ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, হজের রুকন, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং কী কারণে হজ ফাসেদ হয়, কখন ফিদিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়- তা শিক্ষা করা।

৪. কুরবানি সংক্রান্ত মাসআলা শিক্ষা করা ওয়াজিব। কারণ কুরবানির হুকুমগত বিষয়ে মাজহাবগত মতভেদ রয়েছে।

তেরো.

জিহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত থাকা। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জানা অপরিহার্য যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন। জিহাদ বলা হয় কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দ। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।[১৪৬]

---

[১৪৬] সুরা বাকারা, আয়াত ২১৬

জিহাদ ফরজে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত বিধান। যখন প্রয়োজন অনুপাতে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তা আদায় করে, আল্লাহ তায়ালা এর প্রতিদান দান করেন এবং অন্যরাও পাপ থেকে মুক্তি পায়। কারণ, রব্বে কারিম ইরশাদ করেন, 'যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদদের উপবিষ্টদের উপর প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।[১৪৭]

এক্ষেত্রে জিহাদের বিধানাবলি শিক্ষা করা العلم الواجب العيني الخاص এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জিহাদ ক্ষেত্রবিশেষ কখনো ফরজে আইন হয়। এ কারণেই আমরা জিহাদকে العلم الواجب العيني العام এর অন্তর্ভুক্ত করেছি। এরকম স্থান রয়েছে তিনটি। যথা-

১. যখন মুসলমানদের ইমাম নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোত্রকে জিহাদের জন্য আহ্বান জানায়, তখন তাদের উপর জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

    হে মুমিনগণ, তোমাদের কী হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর।[১৪৮]

    নবী আলাইহিস সালাম বর্ণনা করেন, و إذا استنفرتم فانفروا (যখন তোমাদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হয়, তোমরা বেরিয়ে পড়)[১৪৯] একই রকম হুকুম হবে, যখন কোনো সংগ্রামী দল বা মুজাহিদ বাহিনীর আমির তার কোনো অনুসারীকে যুদ্ধে বের হওয়ার আহ্বান জানায়, তখন তার জন্য যুদ্ধে বেরিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। এই বিধান তখনি কার্যকর হবে, যখন উভয় দল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে আমিরের কথা শোনা এবং তার আনুগত্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে।

২. মুসলমানগণ যখন হুকুমগত দিক থেকে ফরজে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত কোনো জিহাদে অংশ নেয়, অতঃপর শত্রুদের মোকাবেলায় মুখোমুখি হয়- তখন তাদের উপর জিহাদ চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা হারাম। অটল-অবিচল থাকা অনিবার্য। আল্লাহ বলেন :

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا

---

[১৪৭] সুরা নিসা, আয়াত ৯৫

[১৪৮] সুরা তাওবা, আয়াত ৩৮

[১৪৯] বুখারি ও মুসলিম।

হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন দৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমার কৃতকার্য হতে পার।[১৫০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত, অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।[১৫১]

৩. যখন শত্রুপক্ষ কোনো শহরে হানা দেয়, তখন শহরবাসীর জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজে আইন। এর দলিল পূর্বেই গত হয়েছে 'সুরা আনফালের ১৫, ১৬ ও ৪৫ নম্বরে আয়াতে'। কারণ, কোনো মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকাতে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করার অর্থ হলো, দুটি দলের সাক্ষাত ও সংঘাত তথা কাফেরগোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলমানদের সংঘাত। মানবরচিত কুফুরি আইন দ্বারা মুসলমানদের শাসনকারী মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করাও ফরজে আইন। কেননা, এরা ইসলামের শত্রু, কাফের এবং মুসলিম দেশগুলো জবরদখলকারী। এদের হাত থেকে মুসলিমদেশগুলো উদ্ধারের জন্য জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। কিন্তু যদি জিহাদের সক্ষমতা না থাকে, তাহলে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন (আনফাল : ৬০),

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার।

এই হলো তিনটি অবস্থা যে তিন অবস্থায় জিহাদ করা ফরজে আইন। জিহাদ একটি ইবাদত; নিয়তের বিশুদ্ধতা ছাড়া আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্যতা পায় না। আর জিহাদ করতে হবে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার লক্ষ্যে, দীনকে সাহায্য করার ইচ্ছায়, সমগ্র ধর্মের উপর আল্লাহর দীন বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে; যদিও মুশরিকরা নাখোশ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

---

[১৫০] সুরা আনফাল, আয়াত ৪৫

[১৫১] সুরা আনফাল, আয়াত ১৫, ১৬

করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করা লক্ষ্যে লড়াই করে, সে আল্লাহর রাস্তায় থাকে।'[১৫২]

জিহাদ ওয়াজিব হবার শর্ত- মুসলিম হওয়া, বালেগ, আকেল, পুরুষ ও স্বাধীন হতে হওয়া। জিহাদের ব্যয়ভার বহন করার মতো সম্পদ থাকা, শরীর সুস্থ থাকা।

মুসলিম পিতা-মাতার অনুমতি নেওয়া এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার থেকে অনুমতি নেওয়া- এই শর্তাবলি ফরজে কেফায়া জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আর ফরজে আইনের সুরতে জিহাদের শর্ত হলো- মুসলিম, বালেগ, আকেল, পুরুষ, শারীরিক সুস্থতা থাকা জরুরি। ফরজে আইন জিহাদের ক্ষেত্রে পিতামাতা ও ঋণদাতার থেকে অনুমতি নেওয়া শর্ত নয়। যেমন অন্যান্য ব্যক্তির থেকে অনুমতি নেওয়া শর্ত না। তাই গোলাম ও সামর্থ্যহীন ব্যক্তি যথাসম্ভব জিহাদ করার চেষ্টা করবে। অনেক ফকিহ বলেন : নারীদের উপরও ফরজে আইন জিহাদ করা ওয়াজিব। তারা অন্যান্য ফরজে আইন বিধানের সাথে জিহাদের বিধানকে কিয়াস করেন। বাস্তব কথা হলো, নারীদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। তবে স্বেচ্ছায় কোনো নারী জিহাদে অবতীর্ণ হলে তার অবকাশ আছে। তবে এটা তার উপর ওয়াজিব না।

চোদ্দ.

বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য এবং শিষ্টাচারের স্বরূপ জানা। যেমন-

১. পিতামাতা যদি কাফেরও হয়, তবু তাদের সাথে সদাচরণ করা। আল্লাহর নাফরমানি না হয় এমনসব আদেশের আনুগত্য করা। আল্লাহ তায়ালা একত্ববাদ ও পিতামাতার আনুগত্যের বিষয়টি বহু আয়াতে একীভূত করেছেন! তিনি বলেন :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরিক কারো না তার সাথে অপর কাউকে। পিতামাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর।[১৫৩]

এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে। সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার বিষয়টি পিতামাতার অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. পাশাপাশি, ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানসন্ততির প্রতি খেয়াল করবে। তাদের ভরণ-পোষণ দেবে। দীনি বিষয়াদি শিক্ষা দেবে। আল্লাহর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে।

---

[১৫২] বুখারি ও মুসলিম।
[১৫৩] সুরা নিসা, আয়াত ৩৬

৩. প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখবে। এটা দায়িত্ববোধের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।
৪. অতিথিদের আপ্যায়ন করবে।
৫. মুসলমান পরস্পরের হক সম্পর্কে জানবে। তার উপর আরোপিত হকসমূহ আদায় করবে। যেমন, সালামের উত্তর দেওয়া, রোগীর শুশ্রূষা করা, জানাজার (মৃত ব্যক্তির) পেছনে তথা কবরের দিকে যাওয়া, অভাবীদের পাশে দাঁড়ানো, দুঃখী মানুষকে সাহায্য করা এবং মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা।
৬. কুরআনসম্মত যেকোনো বিষয়ে মুসলমানদের জন্য তাদের শাসকবর্গকে মেনে চলা, তাদের সম্মান করা, আলেমদের ইজ্জত দেওয়া এবং নেককার ও সম্মানিত ব্যক্তিকে মর্যাদা প্রদান করা অপরিহার্য বটে।
৭. (ঘরে প্রবেশের সময়) অনুমতি চাওয়া, চোখ অবদমিত রাখা এবং অশ্লীল বাক্যালাপ শ্রবণ থেকে কান হেফাজত করা আবশ্যক।
৮. হালাল খাওয়া এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা।
৯. সততা, আমানতদারি, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি পালন ও চুক্তিনামার প্রতি ইহতেমাম করা।
১০. সৎকাজের আদেশ করা। অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা, বিশেষত যখন নিষিদ্ধ কাজটি সামনে এসে যায়।
১১. রবের নাফরমানি হয় না এমন যেকোনো বিষয়ে স্ত্রীর জন্য আবশ্যক স্বামীকে মান্য করা এবং স্বামীর হকসমূহের প্রতি খেয়াল রাখা।

এই সবকটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। এ ছাড়া অন্যান্য শরয়ি শিষ্টাচার জেনে রাখা মুসতাহাব। যেমন, খাবারের আদাব, সোহবতের আদাব, মানুষের সাথে লেনদেনের আচরণবিধি, মাসনুন জিকির-আজকার ও উত্তম আখলাক-চরিত্র।

পনেরো

নিষিদ্ধ বস্তু সম্পর্কে অবহিত থাকা। আল্লাহ যেসব কাজ নিষিদ্ধ করেছেন, যেসব কাজ করলে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন; মুসলমানদের জরুরি হলো তা থেকে বিরত থাকা এবং নিজেকে রক্ষা করা। নিষিদ্ধ কর্মসমূহের কিছু নমুনা নিম্নরূপ :

১. অন্তরের নাফরমানি। তন্মধ্যে একটি হলো, অন্তর থেকে কুফুরি করা, যদিও কথা-কাজে এর প্রকাশ না ঘটে। একেই বলে 'নেফাকে আকবার' তথা বড় নেফাক। যেমন, আল্লাহর অংশীদারিতে বিশ্বাস করা, পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করা, দীন ও শরিয়তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, কুফুরির কারণে কাফেরদের মহব্বত করা।

অন্তরের নাফরমানির দ্বিতীয় বিষয়টি হলো অহংকার, হিংসা, কপটতা, গুনাহের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন এবং গুনাহ করে সন্তুষ্ট থাকা, অন্যায়-

অবিচারের প্রতি আকর্ষণ, কুধারণা, নেকআমলে নিরুৎসাহী পাষাণ হৃদয়, নিন্দা ও ক্রোধ।

২. দণ্ডবিধি পর্যায়ের কবিরা গুনাহ, যা সংঘটিত হলে দুনিয়াতেই হদ আবশ্যক হয়। যেমন- যেমন মুরতাদ হয়ে যাওয়া। (অর্থাৎ এমন কোনো কথা, কাজ ও বিশ্বাস লালন করা, যা কুফুরি হওয়ার বিষয়টি শরয়ি দলিল দ্বারা প্রমাণিত)। এ ছাড়া রয়েছে- অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যিনা করা, অপবাদ দেওয়া, চুরি করা, মদ পান করা ও ডাকাতি করা।

৩. মৌখিক গুনাহসমূহ- যেমন মিথ্যা বলা, গিবত করা, চোগলখোরি করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অপবাদ আরোপ করা, গালি দেওয়া, লানত করা, বিদ্রূপ করা, উপহাস করা, কোনো মুসলিমকে তাচ্ছিল্য করা, অন্যের বিপদে খুশি হওয়া এবং কারো মৃত্যুতে বিলাপ করা।

৪. চোখের গুনাহসমূহ- যেমন, অপরিচিত মহিলা ও শ্মশ্রুহীন বালকের প্রতি কামভাবের সাথে তাকানো। পানশালা, বিনোদনকেন্দ্র, সিনেমা-টেলিভিশন ইত্যাকার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অশ্লীল দৃশ্য-চিত্র দেখা। অন্যায়-অবিচার ও অন্যায়ের কেন্দ্রস্থল দেখে (তা প্রতিহত করার ফিকির না করে) নির্বাক তাকিয়ে দেখতে থাকা।

৫. কানের গুনাহসমূহ- গান-বাজনা ও কদর্য কথাবার্তা শ্রবণ করা। (কোনো মুসলমানের পেছনে লেগে) গুপ্তচরবৃত্তি করা।

৬. লজ্জাস্থানের গুনাহ- যিনায় লিপ্ত হওয়া, পুরুষ সমকামিতা, নারী সমকামিতা, হস্তমৈথুন করা এবং পুরুষদের খতনা করা থেকে বিরত থাকা।

৭. পানাহারের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ- মৃত প্রাণী খাওয়া, রক্ত, শূকরের মাংস ভক্ষণ করা, মদ পান করা, তামাকজাতীয় বস্তুর ধোঁয়া সেবন করা। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব হারাম খাবার রয়েছে; যেমন গৃহপালিত গাধা, হিংস্র প্রাণী ও দন্তবিশিষ্ট পাখির গোশত- তা ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকা। স্বর্ণ-রুপার পাত্রে মহিলা-পুরুষ সকলের জন্য পানাহার করা হারাম।

৮. হারাম সম্পদ- যেমন, চুরি করা, ছিনতাই করা, সুদ খাওয়া, ঘুস দেওয়া, জুয়া খেলা, অন্যের হক আত্মসাৎ করা এবং তাদের হক অস্বীকার করা, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, আমানতের খেয়ানত করা, লেনদেনে প্রতারণা করা, খাদ্য গুদামজাত করা, অপব্যয় করা, অযথা কাজে ব্যয় করা, নিষিদ্ধ জায়গায় খরচ করা এবং হারাম ব্যবসা করা। যেসব সম্পদ হারামভাবে উপার্জন করা হবে, তা খাওয়াও হারাম। আর যারা হারাম ভক্ষণ করবে, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করবে এবং সত্বরই তারা আগুনে প্রবেশ করবে। এ ছাড়া আরও কিছু হারাম উপার্জন প্রক্রিয়া হলো-

হারাম কাজে শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত পারিশ্রমিক। এর দৃষ্টান্ত প্রচুর।

বিত্তবানদের থেকে অন্যায়ভাবে লব্ধ সম্পদ, যা নেওয়া হয়েছে গরিবদের মাঝে সমবণ্টনের জন্য; তা সমাজতন্ত্রের শিরোনামে হোক কিংবা সামাজিক সাম্যের নামে। উক্ত সম্পদ হোক চাষাবাদের জমি কিংবা দালান-কোঠা, ভূসম্পত্তি অথবা নগদ টাকা-পয়সা—সবই বরাবর। সবটাই গ্রহণ করা হারাম। তা নিতান্তই জবরদখল। বৈধ হবে না যতই সময় গড়িয়ে যাক।

যে ব্যক্তি হারাম মাল আত্মসাৎ করে, তার জন্য তাওবা করা ওয়াজিব। তবে তাওবার আগে জরুরি হলো, আত্মসাৎকৃত মাল তার আসল প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। যদি এটা সম্ভব না হয় অথবা ফিরিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা না থাকে (যেমন অবৈধ ইজারা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ) তাহলে এই হারাম মাল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো- সদকা করে দেওয়া। এটাই উক্ত সম্পদের ব্যয়ক্ষেত্র। ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ ও ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ অধিকাংশ স্থানে এমনটি বলেছেন।

৯. পোশাক-আশাক ও গঠন-আকৃতির পাপাচারসমূহ- যেমন, সতর খুলে রাখা। এর আওতায় রয়েছে টাইট-ফিট পোশাক পরিধান করা, যাতে গোপনাঙ্গ পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এমন পাতলা কাপড় অঙ্গে ধারণ করা, যাতে ভিতরের অঙ্গগুলো দৃশ্যমান হয়ে যায়। দেহাবয়ব খোলামেলা রাখা। টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা। পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ও স্বর্ণালংকার পরিধান করা। পুরুষের মহিলার এবং মহিলার পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। কাফের সম্প্রদায়ের অনুকরণ করা। দাড়ি কামানো, ভ্রুপ্লাক করা, পরচুলা লাগানো এবং দাঁত চিকন করা।

১০.মানুষের লেনদেন সম্পর্কিত কিছু অপরাধ- পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা, মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতে আঘাত করা, মুসলমানের সম্ভ্রম নষ্ট করা, তাদের দোষত্রুটি বলে বেড়ানো, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, প্রতারণা করা, শঠতার পথ অবলম্বন করা, জুলুমে সহযোগিতা করা, অন্যায়ভাবে মুসলমানদের ইমামদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, অপরিচিতা মহিলাদের সাথে নির্জনবাস করা এবং মাহরাম ছাড়া মহিলাদের সফর করা।

১১.জানাজা ও কবর বিষয়ক পাপসমূহ- কারো মৃত্যুতে বিলাপ করা, বিদআতি কায়দায় শোক পালনে জমায়েত হওয়া, শরয়ি সীমারেখা লঙ্ঘন করে কবর পাকা করা, কবরে চুনকাম করা, এর উপর বসা, এর দিকে মুখ করে নামাজ পড়া, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা ইত্যাদি। আর কবরপূজা যে শিরকের অন্তর্ভুক্ত- এ বিষয়ে ইতিপূর্বে ইশারা করা হয়েছে।

১২.জাদুবিদ্যা, ভাগ্যগণনা, জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করা হারাম। জাদুকর, গণক ও জ্যোতির্বিদদের কথা অনুযায়ী আমল করা এবং তাদের সত্যায়ন করা হারাম।

১৩. প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা, ছবি রেখে দেওয়া হারাম। তবে প্রয়োজনের কারণে ফটো তোলার বিষয়টি ব্যতিক্রম। প্রতিমূর্তি তৈরি করা এবং তা সংরক্ষণ করাও নিষিদ্ধ।

১৪.মানবরচিত কুফুরি আইনের কাছে বিচার প্রার্থনা করা হারাম। কেননা, এতে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া হয়। সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হারাম—প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করুক অথবা ভোট দেওয়ার মাধ্যমে, কিংবা হোক সহযোগিতা করে। মুরতাদ তাগুত সরকারের বিভিন্ন সামরিক বাহিনীতে কিংবা সরকারের পুলিশ বাহিনীতে চাকরি করা হারাম।

এগুলো হলো জটিল পর্যায়ের পাপাচার, মানুষের এগুলোর প্রতি প্রয়োজন বেশি এবং তারা এই সমস্ত কাজকর্মে লিপ্ত থাকে অধিকমাত্রায়, তাই প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো এই পাপাচারের বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত থাকা। উপর্যুক্ত পাপাচারের অধিকাংশই কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যেসবের ব্যাপারে সতর্কতামূলক আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাই যে এই অন্যায়-অপরাধ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়, তার জন্য অপরিহার্য হলো নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখা এবং তাওবা করা।

ষোলো

তাওবার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা। প্রত্যেক মুসলমানের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি যে, অবাধ্যতা থেকে অনুশোচনার মাধ্যমে ফিরে আসা একটি ওয়াজিব বিধান। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা কর—আন্তরিক তাওবা।'[১৫৪] রব আরও বলেন : 'মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হও।'[১৫৫] এরকমভাবে রব্বে কারিমের ইরশাদ- 'আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর।'[১৫৬] সুরা হুজুরাতে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন : 'যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই জালেম।'[১৫৭] এ তো গেল তাওবা ওয়াজিব হবার উপর কিছু দলিল।

---

[১৫৪] সুরা তাহরিম, আয়াত ৮
[১৫৫] সুরা নুর, আয়াত ৩১
[১৫৬] সুরা হুদ, আয়াত ৩
[১৫৭] সুরা হুজুরাত, আয়াত ১১

শাইখ আস-সাফারিনি আল-হাম্বলি রহ. (মৃত্যু ১১৮৮ হিজরি) বলেন : 'আলেমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা এ বিষয়ে একমত যে, সকল প্রকারের নাফরমানি থেকে তাৎক্ষণিক তাওবা করা ওয়াজিব। বিলম্ব করা নাজায়েজ—নাফরমানি ও পাপাচার ছোট হোক কিংবা বড়। তারা এ বিষয়েও একমত যে, তাওবা হলো ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দীনের শক্তিশালী মূলনীতি।'[১৫৮]

তাওবা সহিহ হওয়ার শর্তাবলি এবং আল্লাহর কাছে তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু নিয়ম রয়েছে। তা হলো :

১. গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। আল্লাহ বলেন—'তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।'[১৫৯]

২. নিজ কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হওয়া। বলেন : 'অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।'[১৬০]
রব্বে কারিম আরও ইরশাদ করেন-'তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর চৌচির হয়ে যায়।'[১৬১]
ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ এখানে 'অন্তর চৌচির হয়ে যাওয়া'র অর্থ করেছেন 'অনুতপ্ত' হওয়া। মুফাসসিরদের অনেকেই এমন অর্থ করেছেন।
ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন : সুতরাং 'নাদাম' তথা অনুতপ্ত হওয়া ব্যতিরেকে তাওবা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না। কেননা, যার মন্দ কাজের উপর অনুশোচনা আসে না; এই অনুশোচনা না আসাই উক্ত কাজে তার সন্তুষ্ট থাকার দলিল এবং বারবার উক্ত কাজ সংঘটিত হবার প্রমাণ। মুসনাদে আহমদে উল্লেখ আছে- التوبة الندم। তাওবা বলা হয় অনুশোচনাকে। [১৬২]

৩. অনেকে 'জবানে ইসতেগফার করাকে' শর্ত করেছেন। কারণ, আল্লাহ বলেন : 'আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তারই প্রতি মনোনিবেশ কর।'[১৬৩] রব্বে কারিম আরও বলেন—'তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের

---

[১৫৮] সাফারিনি রচিত 'লাওয়ামিউল আনওয়ারুল বাহিয়্যাহ' : ১/৩৭২ (মাকতাবাতুল ইসলামি : ১৪১১ হিজরি)

[১৫৯] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫

[১৬০] সুরা হুজুরাত, আয়াত ৬

[১৬১] সুরা তাওবা, আয়াত ১১০

[১৬২] মাদারিযুস সালিকিন : ১/২০২

[১৬৩] সুরা হুদ, আয়াত ৩

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তা করতেই থাকে না।'[১৬৪]

৪. দৃঢ় সংকল্প করা; আর কখনো গুনাহ করবে না। কেননা, রব্বে কারিম ইরশাদ করেন—'যে তাওবা করে এবং সৎকর্ম করে, সে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।'[১৬৫]

প্রভুর ইরশাদ—'অতঃপর যে তাওবা করে স্বীয় জুলুমের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন।'[১৬৬]

৫. কবুলের সময় থাকতে থাকতে তাওবা করে নেওয়া। অর্থাৎ মৃত্যুর বিভীষিকা আসার আগেভাগেই তাওবা করা। আল্লাহ্ বলেন : 'এমন লোকদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তাওবা করছি।'

নবী আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন—'নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন, যতক্ষণ না মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়।'[১৬৭]

৬. হুকুক আদায় এবং বান্দার (হুকুক আদায়ে) নাফরমানি; তা দু' প্রকার-

আল্লাহর হকের ব্যাপারে নাফরমানি : এটা আবার দু' প্রকার। প্রথম প্রকার হলো, এতে হক আদায়ের কোনো প্রশ্ন নেই; বরং তাওবার বিষয়ে পূর্বের শর্তগুলোই যথেষ্ট। যেমন, মদ পান করা। দ্বিতীয় প্রকারে হক আদায়ের বিষয় থাকে। যেমন, রোজা পালনে ত্রুটি করা, জাকাত, কাফফারা, ফিদিয়া, মানত ইত্যাদি আদায়ে উদাসীন থাকা। এমতাবস্থায় তার জন্য আবশ্যক হলো অবহেলিত বিষয়গুলোর কাযা আদায় করা।

মানুষের হকের ব্যাপারে নাফরমানি : যেমন তাদের জান, মাল ও ইজ্জতে আঘাত করা। যদি কেউ কারো ইজ্জতে আঘাত করে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে এবং বিষয়টা তার থেকে বৈধ করিয়ে নেবে। যদি তার সম্পদ আত্মসাৎ করে, তাহলে সম্ভব হলে সম্পদ ফিরিয়ে দেবে, অন্যথায় তার পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। আর যদি শারীরিকভাবে অত্যাচার করে, তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তিকে কেসাস গ্রহণ করার সুযোগ দেবে কিংবা তাকে দিয়ত প্রদান করবে অথবা পরিস্থিতি বিবেচনায় জরিমানা দেবে।

---

[১৬৪] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫

[১৬৫] সুরা ফুরকান, আয়াত ৭১

[১৬৬] সুরা মায়েদা, আয়াত ৩৯

[১৬৭] তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান এবং তা ইবনে উমর থেকে বর্ণিত।

নববি রহিমাহুল্লাহসহ অনেক আলেম তাওবার শুধু চারটি শর্তের কথা বলেছেন। কেউ আবার দশেরও অধিক শর্তের কথা বলেছেন। যেমনটি ইবনে হাজার হাইতামি রহিমাহুল্লাহ তার রচিত الزواجر। কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আমি এই সকল শর্ত থেকে ছয়টি বাছাই করে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কোনো কোনো আলেম বলেন : বিলম্বে হলেও তাওবা করা আবশ্যক।

শেষকথা

যাই হোক, এই ছিল العلم الواجب العيني العام এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা, যে বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। সুতরাং একজন মুসলমানের জন্য জরুরি হলো সে ইসলাম ও ঈমানের রুকনসমূহ জানবে। তাওহিদের তাৎপর্য উপলব্ধি করবে। শিরক ও কুফুরের ব্যাখ্যা বুঝবে, যাতে তার ঈমান সহিহ-শুদ্ধ হয়। ঈমান ভেঙ্গে যায় এমন কোনো কাজে জড়িত হয়ে যেন তার ঈমান বিনষ্ট না হয়।

একজন মুসলমান পবিত্রতা, সালাত, জাকাত, সাওম, হজ ও জিহাদের বিধান ও আহকাম শিক্ষা করবে, যাতে সঠিক উপায়ে ইবাদত সম্পন্ন করতে পারে। এরকমভাবে অবশ্যপালনীয় বিধানাবলি, শরিয়তসমর্থিত আদব-শিষ্টাচার, হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে, যাতে লেনদেন ও মুআমালা সহিহভাবে পালিত হয়।

বিস্তারিত দলিল-দস্তাবেজ জানা সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব নয়। এর সমস্ত কারণ আমরা ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি। বরং দীনের প্রত্যেকটি জরুরি বিষয়ের হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকাই একজন মুমিনের জন্য যথেষ্ট হবে। একজন মুমিন জানবে যে, কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুম কোনটি—যদিও বিস্তারিত দলিলাদি জানা না থাকে (এতে কোনো সমস্যা নেই)।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব হলো, আমাদের আলোচিত বিগত বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এরপর তার পরিবার-পরিজন, সন্তানসন্ততি এবং তাদের অধীনস্থদের তা শিক্ষা দেওয়া। আলেম এবং সামর্থ্যবান প্রত্যেকের জন্য জরুরি হলো, তারা এই আবশ্যক ইলমকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবে। মুসলমানদের বিভিন্ন ইস্যুতে যারা শাসকের ভূমিকায় থাকেন, তারা মানুষকে এই ইলম শিখতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং এতে তাদের সহযোগিতা করবে।

ফায়েদা : আবু আবদুল্লাহ ইবনে বাত্তা রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৩৮৭ হিজরি) রচিত الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية কিতাবে একটি ফায়দা উল্লেখ রয়েছে। আবু আবদুল্লাহ আহলে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এমন একজন আলেম, যার কাছ থেকে ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তার 'মাজমাউল ফাতওয়া' কিতাবের অধিকাংশ

আলোচনা রেওয়ায়েত করেছেন। আমি আবু আবদুল্লাহ ইবনে বাত্তাকে দেখেছি, তিনি জাহহাক ইবনে মুজাহিম[১৬৮] থেকে- ঈমানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন, যাকে العلم الواجب العيني العام এর সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে। এখানে আমি তা উল্লেখ করব, যাতে আমার মুসলমান ভাইবোনেরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে বাত্তা জাহহাক ইবনে মুজাহিম-এর সূত্রে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন : বান্দার জন্য উচিত হলো আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও তারিফের মাধ্যমে কথা শুরু করা। কেননা, সকল প্রশংসা তারই। আমরা তার প্রশংসা করি এবং তারই গুণকীর্তন করি। কারণ, তিনি আমাদের সেবায় বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেছেন। ইসলামের পথে আমাদের পরিচালিত করেছেন। কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। নবী মুহাম্মদ সা.-কে প্রেরণ করে আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। (তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করি; কারণ, তিনি আমাদের দিয়েছেন) তার দীন, যা দিয়ে তিনি নবী সা.-কে প্রেরণ করেছেন তথা ঈমান। আর ঈমানই হলো ইসলাম। তা নিয়েই পূববর্তী রাসুলগণ প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশ দিয়েই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।[১৬৯]

ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা, আখেরাত, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবী ও সিদ্দিকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর প্রেরিত শরিয়তের উপর বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি দেওয়া। তার হুকুম ও ফয়সালা মেনে নেওয়া। তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। এগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে পরিপূর্ণ মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। আর যে মুমিনের কাতারে শামিল হয়, আল্লাহ তার জান-মাল অন্যের জন্য হারাম করে দেন। মুসলমানের উপর আরোপিত বিধানগুলো তার উপরে ওয়াজিব হয়ে পড়ে। তবে নেকি ও সম্মান অর্জন করতে হলে আমল করতে হবে। ঈমানের প্রতিদান প্রাপ্তি আমলের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

আমলের পরিচয়

আমল বলা হয়—নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করা এবং হারাম কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার একনিষ্ঠ আনুগত্য করা। সালাফে

---

[১৬৮] জাহহাক খোরাসানের একজন প্রসিদ্ধ তাবেতাবেয়ি।

[১৬৯] সুরা আমবিয়া, আয়াত ২৫

সালেহিনের অনুকরণ করা। সালাত কায়েম করা। জাকাত প্রদান করা। রমজানের রোজা রাখা। সামর্থ্য থাকলে হজ করা। জুমআ ও জিহাদের পাবন্দি করা। জানাবাত তথা শরীর নাপাক হলে গোসল করা। পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা। সালাতের জন্য ওজু করা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং আল্লাহ তায়ালা যার সাথে সম্পর্ক রাখার আদেশ করেছেন- তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। বন্ধুবান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা। নিকটাত্মীয়দের মঙ্গল কামনা করা। পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির, ভিক্ষুক, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও চুক্তিবদ্ধ গোলাম; সকলের হক সম্পর্কে জানা। সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা। কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। নিন্দা করলে আল্লাহর জন্যই করা। নিকটস্থ লোকদের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা এবং শত্রুদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফয়সালা করা। মুমিন শাসকবর্গের আনুগত্য করা। (অবস্থাভেদে) রাগ করা এবং সন্তুষ্ট থাকা। অঙ্গীকার পূরণ করা। সত্য কথা বলা। মানত পুরা করা। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। আমানতের হেফাজত করা, তা গোপন কোনো কথা হোক কিংবা সম্পদ। আমানত তার প্রাপ্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়ে দেওয়া। দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়াদি ঋণপত্র লিখে রাখা। চুক্তি সম্পাদনকালে সাক্ষী রাখা। সাক্ষ্য দেওয়ার আহ্বানে সাড়া দেওয়া। আল্লাহ শিক্ষা অনুযায়ী ইনসাফের সাথে চুক্তিপত্র লিখে রাখা। দীপ্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দেওয়া; নিজ, নিজের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিষয়ে হলেও। সততার সাথে মাপ পরিপূর্ণ করা। عزائم الامور তথা ধৈর্যের প্রয়োজন হয় এমন গুরুতর[১৭০] পদক্ষেপের সময়সহ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা। জানের হেফাজত করা। চোখ অবদমিত রাখা। লজ্জাস্থানের হেফাজত করা। নিষিদ্ধ কাজকর্ম থেকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করা। ক্রোধ দমন করা। মন্দ কর্মকে ভালো কর্ম দ্বারা দূরীভূত করা।

বিপদে ধৈর্য ধরা। ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে ভারসাম্য বজায় রাখা। চলাফেরা ও কাজ-কারবারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহঅভিমুখী হওয়া। গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সত্য ও সত্যবাদীদের পরিচয় জানা। ইনসাফকারীকে দেখে ইনসাফ শিক্ষা করা এবং জালেমকে দেখে জুলুম সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, যাতে নিজের দ্বারা উক্ত কাজ সংঘটিত হচ্ছে কি না মানুষ তা বুঝতে পারে। আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। মতভেদপূর্ণ

---

[১৭০] عزائم الامور বলা হয় মূলত এমন সব কাজকে, যা আদায় করতে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয়, যেমন সালাত কায়েম করা, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

হুকুম-আহকাম আলেমদের উপর ন্যস্ত করা। অবতীর্ণ কুরআন এবং চিরন্তন সুন্নাহর সর্বসম্মত বিধানের উপর অবিচল থাকা। কারণ, তা সুস্পষ্ট সত্য। এতে কোনো সংশয় নেই। বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বিষয়কে শাসকবর্গের নিকট অর্পণ করা, যাতে তারা নির্বাচন করে নিতে পারে। সংশয়পূর্ণ বিষয় পরিহার করে সন্দেহাতীত বিষয় গ্রহণ করা। ঘরে প্রবেশের সময় অনুমতি নেওয়া। যতক্ষণ অনুমোদন না মিলবে ঘরে প্রবেশ না করা। ঘরের ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারা কিংবা কান পেতে শোনার আগে ঘরওয়ালাদের সালাম দেওয়া। যদি ঘরে কাউকে না পাওয়া যায়, অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ না করা। যদি ঘরের ভিতর থেকে বলা হয়-'ফিরে যান'। ফিরে যাওয়াই উত্তম। তবে অনুমতি মিললে প্রবেশ করতে পারবে।

সুতরাং ঘর যদি এমন হয়; কেউ তাতে থাকে না, এদিকে মুসাফির বা অন্য কারো উক্ত ঘরে থাকার কিংবা আরাম করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে অনুমতির প্রয়োজন নেই। গোলাম ছোট হোক কিংবা বড় এবং পরিবারের নাবালেগ সদস্যরা রাতদিনে তিন সময়ে অনুমতি নেবে—'শেষরাতে অর্থাৎ ফজরের পূর্বে, কাইলুলা তথা দিনের মধ্যভাগে খাবারের পর যখন ঘরের মালিক তার স্ত্রীকে নিয়ে বিশ্রামে থাকে, এশার নামাজের পর যখন ঘরের মালিক তার স্ত্রীকে নিয়ে বিছানায় থাকে। আর যখন পরিবারের সদস্যরা বালেগ হয়ে যাবে, তাদের উপর সর্বাবস্থায় অনুমতি ওয়াজিব নেওয়া।

আল্লাহ তায়ালা যার জান হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা। তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে হলে ভিন্ন কথা। অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ না করা। তবে পরস্পরের সম্মতি থাকলে কোনো সমস্যা নেই। অবিচার করে এতিমের সম্পদ গ্রাস না করা। মদ্যপান পরিহার করা। হারাম খাবার ও পানীয় না খাওয়া। সুদ ও জবরদখলকৃত সম্পদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। জুয়া, ঘুস ও ছিনতাই-রাহজানি থেকে নিজেকে সংযত করা। ধোঁকা-প্রতারণা প্রত্যাখ্যান করা। অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন বন্ধ করা। অপচয় ও অন্যায় পথে খরচ না করে মিতব্যয়ী হওয়া। ওজন ও মাপে কম না দেওয়া। পরিমাপযন্ত্রে ও দাড়িপাল্লায় হেরফের করা থেকে নিজেকে সংযত রাখা। চুক্তি ভঙ্গ না করা। ইমামগণের বিধিনিষেধ মান্য করা। বিশ্বাসঘাতকতা ও অবাধ্যতা পরিহার করা। মিথ্যা কসমের ব্যাপারে সংযমী হওয়া। সত্য-মিথ্যার মিশ্রণযুক্ত কসম এড়িয়ে চলা। মিথ্যা ও অতিশয়োক্তি থেকে নিজেকে সংবরণ করা। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া। অপবাদ আরোপ না করা। সতী-সাধ্বী নারীর গায়ে কালিমা লেপন করা থেকে বিরত থাকা। কটাক্ষ, টিপ্পনী ও নাম খেতাবি না করা। গিবত, চোগলখোরি করা থেকে সংযমী হওয়া। কারো পেছনে না পড়া। নেককার ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা না করা। অন্যায়-অপরাধ ও

তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এর উপর অনড় থাকার মানসিকতা পরিহার করা। সত্যবিমুখতা পরিহার করা। ভ্রান্তিতে নিপতিত না থাকা। নেকআমলের ব্যাপারে অবহেলা না করা। অহঙ্কার, বড়াই, অহমিকা ও দাম্ভিকতা পরিহার করে চলা। পাপাচার-অশ্লীলতা পরহেজ করা। মন্দ কাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া। আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। অহমিকা-উল্লাস বর্জন করা। অনর্থবোধক, বা অপ্রয়োজনীয় শব্দচয়ন থেকে বিরত থাকা। অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। অহেতুক মন্দ ধারণা না করা। পেশাবের ছিটা ও যাবতীয় অশ্লীল জিনিস থেকে সতর্ক থাকা। এটাই হলো আল্লাহর দীনের ব্যাখ্যা। তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত বিধান এবং তিনি হালাল-হারাম ও সুন্নাত-ফরজসমূহের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এসব কিছুই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি তোমাদের জন্য এমনসব বিষয় তুলে ধরেছেন, যার দ্বারা বিজ্ঞজনরা উপকৃত হতে পারে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর অধিকতর জ্ঞানীজন রয়েছে। আর উপর্যুক্ত সমস্ত বিষয়ের বাস্তবতা তাকওয়া অর্জনের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের ও তোমাদের তাওফিক দান করেন, যাতে আমরা তার সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জন করতে পারি (জাহহাক ইবনে মুজাহিমের আলোচনা এখানে সমাপ্ত)।

শাইখ আবু আবদুল্লাহ ইবনে বাত্তা বলেন : 'ভাইয়েরা আমার, (আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন) ঈমানের তাৎপর্য, এর শাখা-প্রশাখা এবং মুমিনদের আদব-আখলাক যাদের মাঝে পরিপূর্ণ থাকবে, তারাই ঈমানের হাকিকতের উপর আছে, তাদের মধ্যে রয়েছে হেদায়েতের অন্তর্ভেদী তাৎপর্য এবং তাকওয়া-আল্লাহভীতির চূড়ান্ত পর্যায়। যখনই বান্দার ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়, দীনি বিষয়ে দূরদর্শিতা বেড়ে যায় এবং বিশ্বাসের শক্তির উন্মেষ ঘটে, তখন (বুঝতে হবে) তার এই আখলাক-চরিত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য শিষ্টাচারের উন্মেষ ঘটেছে। কথা ও কাজে এর আলামত প্রকাশ পাবে। নিদর্শন দৃশ্যমান হবে।

উপরে আলোচিত ঈমানের ব্যাখ্যায় কুরআন যে কথা বলে, সুন্নাহ তা প্রমাণ করে, বিবেক তার সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ ঈমানদারের মর্যাদা উঁচু করুন, মাকাম সমুন্নত করুন এবং তার কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করুন। আর বান্দার মধ্যে ঈমানের ত্রুটি এলে, বিশ্বাসে দুর্বলতা দেখা দিলে, (মনে করতে হবে) তার আখলাকে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কাজকর্মে ও স্বভাব-চরিত্রে নৈতিকতার অধঃপতন ঘটেছে। আল্লাহ

তায়ালা আমাদের ও তোমাদের উভয় জাহানে তার সন্তুষ্টি হাসিল করার তাওফিক দান করুন। সকল প্রকারের বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করুন।[১৭১]

العلم الواجب العيني العام (তথা, যে ইলম প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা করা ওয়াজিব) শিরোনামের এই হলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা, যা জাহহাক ইবনে মুজাহিম থেকে বর্ণিত (তার মৃত্যু ঘটেছিল দ্বিতীয় হিজরির শুরুর দিকে); যাতে রয়েছে, ঈমান ও ইসলামের রুকনসমূহের বয়ান, অবশ্যপালনীয় বিধান, শরয়ি আদব-শিষ্টাচার ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের আলোচনা। আরও রয়েছে—পছন্দনীয় চালচলন এবং উত্তম চরিত্রের একগুচ্ছ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

এরপর আমরা ফরজে আইন ইলমের দ্বিতীয় প্রকারের বয়ান নিয়ে হাজির হব। প্রকারটি হলো العلم الواجب العيني الخاص (এমন ইলম; যা শিক্ষা করা সবার জন্য আবশ্যক নয়, বিশেষ কিছু ব্যক্তি আদায় করলেই যথেষ্ট)

দ্বিতীয়ত العلم الواجب العيني الخاص

এই প্রকার ইলম পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে কিছু লোকের উপর ওয়াজিব হয়, সকলের উপর নয়। আবার কখনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর বিশেষ সময়ে জরুরি হয়, সবসময় নয়। সুতরাং যেই ব্যক্তির উপরই শরয়ি দায়িত্ব (যেমন, হজ, জাকাত) আরোপিত হয় এবং যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কাজের অবতারণা করে (যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়েশাদি) এরকম ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হলো, উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করা। কারণ, যেকোনো বিষয়ে কথা ও কাজের পূর্বে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি।

ইবনে হাজম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এরপর আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির উপর জাকাতসংক্রান্ত বিধান শিক্ষা করা ফরজ করেছেন। সম্পদশালী ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা নারী, গোলাম হোক কিংবা স্বাধীন। সুতরাং যে একেবারে রিক্তহস্ত, তার উপর জাকাতসংক্রান্ত সকল বিধান শিক্ষা করা আবশ্যক নয়।

অতঃপর যার উপর হজ ফরজ হয়, তার জন্য হজ ও উমরার নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত হওয়া ওয়াজিব। তবে যার শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে এবং যে সহায়-সম্বলহীন, তার জন্য হজ ও উমরার ইলম শেখা জরুরি নয়। সামরিক বাহিনীর অফিসারদের জন্য জরুরি হলো যুদ্ধনীতি ও জিহাদসংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধের জ্ঞান লাভ করা, গনিমত ও ফাই-এর বণ্টননীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

---

[১৭১] আবু আবদুল্লাহ ইবনে বাত্তা রচিত الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية কিতাব থেকে চয়নকৃতঃ ২/৬৫০-৬৫৩ (দারুর রায়াহ : ১৪০৯ হিজরি)

এরপর রব্বে কারিম শাসনকর্তা ও বিচারকের জিম্মায় অনিবার্য করে দিয়েছেন মামলা-মোকাদ্দমা ও হুদুদ-কিসাসের ইলম অর্জন করা। অন্যান্যের বেলায় এ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা জরুরি নয়।

অতঃপর ব্যবসায় এবং শস্যাদি উৎপাদন ও কেনাবেচায় জড়িত ব্যক্তির উপর আল্লাহ ফরজ করেছেন—তারা মুআমালাত তথা ক্রয়-বিক্রয়সংশ্লিষ্ট বিধান জানবে। কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম সে সম্পর্কে অবগত হবে। তবে যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত না, তাদের জন্য এ সংক্রান্ত বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া জরুরি নয়।

এরকম আরেকটি বিষয় হলো- যে শহরে কোনো বিদআতি কিংবা পথভ্রষ্ট গোমরাহ গোষ্ঠী- যেমন, শিয়া, খারেজি, কাদিয়ানি, বাহায়ি, ভন্ড সুফি এবং অন্যান্য ভ্রান্ত দলের লোকজন বসবাস করে, শহরবাসীর জন্য অপরিহার্য হলো এমন বিষয়ে ইলম শিক্ষা করা, যার দ্বারা সে উক্ত বিদআত ও গোমরাহি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। ঈমানের পদস্খলন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। অতএব, উক্ত শহরবাসীর উপর ফরজ হচ্ছে তারা ঈমানে মুফাসসাল তথা ঈমানের বিস্তারিত বিষয়াদির ব্যাপারে ইলম অর্জন করবে। এই শহরবাসী যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, যারা এর মুখোমুখি হয়নি তাদের উপর এটা ওয়াজিব নয়। এই ছিল আবু হামেদ গাজালি রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য।

সুতরাং আকিদা, ইবাদতে কলবিয়্যা ও এ সংক্রান্ত ইলম অর্জন মানুষের মনের অবস্থাভেদে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যদি তার অন্তরে কালিমায়ে তাওহিদের মর্মার্থ অনুধাবনে সংশয়ের উদ্রেক দেখা দেয়, তাহলে তার উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে এরকম বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা, যার মাধ্যমে উক্ত সংশয়ের নিরসন ঘটে। তবে বিষয়টা যদি এরকম হয় যে তার অন্তরে সংশয়ের কোনো উদ্রেক নেই। অতঃপর তার মৃত্যু হয়ে গেল- এ কথা জানার পূর্বেই যে, আল্লাহর কালাম চিরন্তন, আল্লাহর সত্তা দর্শনযোগ্য, তিনি অবিনশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ আকিদা প্রসঙ্গে সাধারণত যা আলোচিত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইসলামের উপর হয়েছে—এ মর্মে সকলেই একমত। কারণ, ওই সমস্ত আকিদা সম্পর্কিত দ্বিধা-সংশয়, যাকে কেন্দ্র করে উক্ত বিষয়াবলির জ্ঞানার্জন জরুরি—সেই সংশয়ের কিছু তো স্বভাবগত কারণে জাগ্রত হয় আর কিছু নগরবাসীর সাথে ওঠাবসার মাধ্যমে (আলোচিত ব্যক্তি তো উক্ত কারণ থেকে মুক্ত)।

যদি কোনো ব্যক্তি এরকম শহরে থাকে, যেখানে মানুষের মাঝে ভ্রান্ত বিষয়ে যুক্তি-তর্কের ছড়াছড়ি দেখা দেয়, তখন ওই ব্যক্তির করণীয় হলো, উক্ত শহরে পৌঁছামাত্র প্রথমে নিজের সত্যগ্রহণের বিষয়টি জানান দেওয়া। যদি তার সামনে বাতিল পেশ করা হয়, আবশ্যক হলো ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করা। তবে অনেক

সময় এরকম পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এরকমভাবে মুসলিম ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ী হয়, আর শহরে সুদের ব্যাপক প্রচলন ঘটে, তখন তার জন্য অনিবার্য হলো সে সুদি লেনদেন এড়িয়ে চলার জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া।

ফরজে আইন ইলমের এই ছিল নির্মোহ বিশ্লেষণ—যার সারাংশ হলো, ফরজ দায়িত্ব-কর্তব্য আনজাম দেওয়ার ইলম হাসিল করা। সুতরাং যে প্রয়োজনীয় ইলম শিক্ষা করে এবং কখন এই ইলম শিক্ষা করা আবশ্যক—এ সম্পর্কে অবগত থাকে, সে যেন ফরজে আইন ইলম অর্জন করে নিল। [১৭২]

এরকমভাবে যে ব্যক্তি কোনো কাজে উদ্যোগী হয়, আবশ্যক হলো এর হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। দূরদর্শিতার সাথে কাজের আনজাম দেবে। জিজ্ঞেস করবে কাজটা করা তার জন্য বৈধ হবে কি না? উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চায় অথবা তার ইচ্ছা- সে কোনো পেশা ও চাকরিতে যোগদান করবে কিংবা আর্থিক কোনো লেনদেন করবে ইত্যাদি। এরকম ব্যক্তির জন্য উক্ত বিষয়ের শরয়ি বৈধতা জেনে নেওয়া ওয়াজিব।

বিস্তারিত বিধানসংবলিত যেকোনো ইস্যুতে যখন কোনো ব্যক্তি মনোনিবেশ করবে, তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞানার্জন করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে। আর এই সবকটির মূলে রয়েছে—وجوب العلم قبل القول و العمل (অর্থাৎ কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব) মূলনীতিটি।

এখন আমরা ফরজে আইন ইলমের তৃতীয় প্রকারের বয়ান নিয়ে হাজির হবো।

তৃতীয়ত النوازل তথা সমসাময়িক ঘটনার আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন

العام ও الخاص এর প্রকার-দুটিসহ العلم الواجب العيني এর পরিচয় হলো, এমনসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা, যা মানুষের জীবনে বারবার সংঘটিত হয়, কখনো তার থেকে পৃথক হয় না। সুতরাং যে বিষয়গুলো ঘটা বিরল পর্যায়ের, সূচনালগ্নে তার হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন জরুরি না। তবে উক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হয় এমন প্রত্যেকের উচিত এর বিধিনিষেধ জেনে নেওয়া, যাতে অজ্ঞাতসারে সে এমন কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে।

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহর বক্তব্যে এই তৃতীয় প্রকারের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে- উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় বান্দার উপর অপরিহার্য হলো বারবার সংঘটিত অবশ্যপালনীয় বিধানগুলোর ব্যাপারে অবগত থাকা। বিরল বিষয়গুলোর ব্যাপারে নয়। যখন বিরল বিষয়গুলো বাস্তবতায় আসবে, তখন এর বিধানাবলি জানা

---

[১৭২] ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন : ১/২৬

জরুরি হবে।[১৭৩] সুতরাং ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ النوازل এর ব্যাখ্যা করেছেন 'যা কদাচিৎ ঘটে থাকে' বলে।

নববি রহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, যখন নতুন কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন বান্দার কাজ হলো এর শরয়ি সমাধান জিজ্ঞেস করে শিখে নেবে। যদি তার বসবাসরত শহরে ফতোয়া জিজ্ঞেস করার মতো এমন কাউকে না পাওয়া যায়, তাহলে ফতোয়া দিতে পারে এমন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। যদিও তার বাসস্থান অনেকদূরে থাকে। সালাফদের এক বিরাট অংশ একটি মাসআলার জন্য দিনরাত সফর করেছেন।[১৭৪]

খতিব বাগদাদি রহিমাহুল্লাহু ও ইবনে আবদুল বার রহিমাহুল্লাহু আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : দীনি প্রেক্ষাপটের যেকোনো বিষয়ে যখন কেউ মনোনিবেশ করে, তার উপর ওয়াজিব হলো, সে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে।[১৭৫]

আবু হামেদ গাজালি النوازل এর ব্যাখ্যায় বলেন, দিনরাতের চলমান অবস্থায় ইবাদত ও মুআমালাত পালনে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনসব নতুন নতুন ঘটনার সম্মুখীন হয়, যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই উক্ত ব্যক্তির উচিত হলো, ঘটিত বিষয়গুলোর (শরয়ি সমাধান) জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে এবং যে সমস্ত বিষয় অচিরেই ঘটতে যাচ্ছে বলে প্রবল ধারণা হয়, তা শিক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে।[১৭৬]

বিভিন্ন শহরের সাধারণ মুসলমানগণ নব-সংঘটিত অনেক ঘটনার সমাধানে নানামুখী সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের মাঝে ফয়সালা হচ্ছে শরিয়াহবিরোধী মানবরচিত আইনের ভিত্তিতে। তাই নর-নারী প্রাপ্তবয়স্ক সমগ্র মুসলমানের জন্য জরুরি হলো, এই নব-সংঘটিত ঘটনাবলির (শরয়ি) হুকুম জানা। কারণ, এই হুকুমকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকের উপর আবশ্যিক দায়িত্ব সাব্যস্ত হয়।

সমসাময়িক বিষয়ের আরেকটি হচ্ছে, গণতান্ত্রিক স্লোগান এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলসমূহ ও আইনপরিষদ। এর আওতায় আরও রয়েছে মনোনয়ন ও প্রার্থীনির্বাচন। এই সবই হলো বড় শিরক। কোনো মুসলমানেরই জায়েজ হবে না শিরকে লিপ্ত থাকা। বরং আবশ্যক হলো, নিজেকে শিরক থেকে বিরত রাখবে এবং অন্যকে সতর্ক করবে।

---

[১৭৩] আল-মাজমু : ১/২৫

[১৭৪] আল-মাজমু : ১/৫৪

[১৭৫] আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ : ১/৪৫। জামিউ বয়ানিল ইলমি : ১/১০

[১৭৬] ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন : ১/২৭

ইলমের প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলোচনার আমরা এখানেই ইতি টানতে যাচ্ছি, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আলোচনার মূল মাকসাদ হলো, আল্লাহর বিধান না জেনে কোনো কাজকর্মে মনোনিবেশ করা বৈধ নয়- এ বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো, সৃষ্টিজগতে যা কিছু রয়েছে তার শরয়ি হুকুম কী- এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা। আল্লাহ্ বলেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি প্রত্যেক জিনিসের বর্ণনাস্বরূপ।[১৭৭]

যেকোনো বস্তু পাঁচটি হুকুমের কোনো একটি থেকে খালি নয়। হুকুম পাঁচটি হলো- ওয়াজিব, মুসতাহাব, মুবাহ, মাকরুহ ও হারাম। কোনোকিছুর হুকুম হয়তো কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট থাকবে কিংবা আলেমগণ বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে হুকুম বের করে নেবেন। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে 'মানবকল্যাণে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত শরিয়াহ্ পালন' সম্পর্কিত আলোচনায় ইশারা করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালার জন্য।

---

[১৭৭] সুরা নাহল, আয়াত ৮৯